আত্ম-উন্নয়ন

শিবলু

আধুনিক নিয়মে লেখাপড়া

ডা. রেজা আহমদ

একটি রেমাশ নিবেদন

লিমন

আত্ম-উন্নয়ন

আধুনিক নিয়মে লেখাপড়া

[পরিমার্জিত সংস্করণ]

ডা. রেজা আহমদ
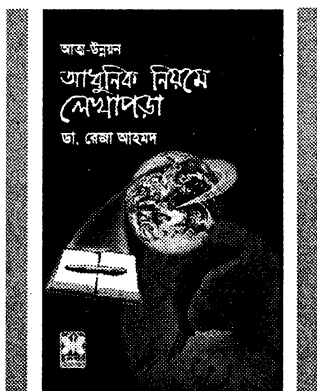
সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক

সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

ISBN 984-16-6041-5
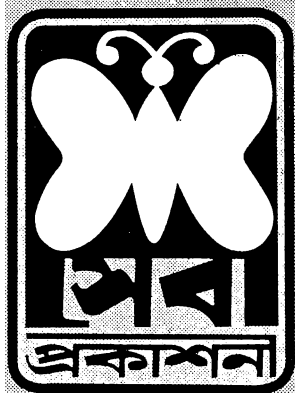
প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ ২০০৭

পরিমার্জিত সংস্করণ ২০০৯

প্রচ্ছদ বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও বক্স: ৮৫০
e-mail. sebaprok@citechco.net
Website. www.Boi-Mela.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল ০১৭১৮ ১৯০২০৩

ADHUNIK NIYOMEY LEKHAPAUDA
By: Dr. Reza Ahmad

আটত্রিশ টাকা

উৎসর্গ

আমার মা 'হোসনে আরা বেগম'

ও

বাবা 'সুলতান আহমেদ' কে

সূচি

বিস্ময়যাত্রা

২০০১ সালের এক শুক্রবার সকাল। আপনি হয়তো বসে বসে ভাবছেন আজকের ছুটির দিনটা কীভাবে কাটাবেন। আপনার চিন্তার বিঘ্ন ঘটাতেই বেজে উঠল টেলিফোনটা। রিসিভার তুলেই ভরাট কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। ফোনটা এসেছে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় থেকে। আপনাকে জানানো হলো আগামী তিনবছরের মধ্যে মহাখালীতে একটা ফ্লাইওভার বানাতে হবে। এর জন্য যে অর্থ প্রয়োজন তা আপনাকে দেওয়া হবে। আর কাজ শেষে পারিশ্রমিক হিসেবে পাবেন ৫০ লাখ টাকা। অভাবনীয় অফার। কিন্তু, আপনি তা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন। কারণ, আপনি কোন ইঞ্জিনিয়ার বা আর্কিটেক্ট নন। এমন কোন কাজ আপনি কখনোই করেননি। ভাবছেন, ক্রস কানেকশনে আপনার কাছে কল চলে এসেছে। কিন্তু, তা সত্যি নয়। আপনার অসম্মতি শুনে এবার আসল কথা জানানো হলো। আপনার মা সরকারের হেফাজতে আছেন। তিন বছরের মাঝে ফ্লাইওভার বানাতে না পারলে তাঁকে আর ফেরত পাবেন না। এবার কি আপনি রাজি?

এখন আপনার উত্তর হবে, এ কাজ করার জন্য আমি কী কী সুবিধা পাব? এই তো। খুব একটা কঠিন কাজ না। আপনি প্রথমে দেশসেরা আর্কিটেক্টের সাথে কন্ট্রাক্ট করলেন। তিনি মহাখালীর ম্যাপ নিয়ে ফ্লাইওভারের ডিজাইন বানিয়ে দিলেন। আর কীভাবে তৈরি করা হবে তা বুঝিয়ে দিলেন। এবার ছুটলেন ইঞ্জিনিয়ারের

কাছে যিনি পরিচালনা করবেন। আর, যোগাযোগ করলেন কন্ট্রাক্টারদের সাথে যাঁরা শ্রমিক সরবরাহ করবেন। এ ফ্লাইওভার বানানোর অনুমতিপত্র, বিকল্প রাস্তার ব্যবস্থা করলেন রাজউকের সাহায্যে। মাস তিনেকের মধ্যে কাজ শুরু হয়ে গেল। তিনবছর পর আপনি মহাখালীতে দেখতে পেলেন একটা চমৎকার ফ্লাইওভার।

নিশ্চয়ই এভাবে ফ্লাইওভারটা তৈরি হয়নি এ রূপক গল্পটাই এ বইয়ের সারমর্ম। আমাদের সবার, আমি আবার বলছি, সবার মাঝেই আছে অসাধারণ প্রতিভা। আমরা মানুষ, সৃষ্টির সেরা জীব। আমরা চাইলে করতে পারি না এমন কাজ খুবই অল্প। হয় আমাদের ইচ্ছে হয় না, ইচ্ছে হলে উদ্যোগ হয় না, উদ্যোগ হলে সময় নেই, এমন নানা অজুহাতে আমাদের প্রতিভা সুপ্তই থেকে যায়। এ বইয়ে আপনার সেই সুপ্ত প্রতিভাকে জাগিয়ে তুলে তা কাজে লাগানোর সর্বাধুনিক পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে। আপনাকে যা করতে হবে তা হলো এ বইয়ের অনুশীলনগুলো সাথে সাথে করে ফেলা। আর এগুলো পরবর্তীতে পড়ালেখা, ক্যারিয়ার বা জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে, যাতে আপনি সফল হতে চান, তাতে কাজে লাগানো। আপনি নিজেই বিস্মিত হবেন নিজের ক্ষমতায়, আবিষ্কার করবেন নিজের অনন্যতা। তবে, আপনাকে ধৈর্য ধরতে হবে আর পরিশ্রম করতে হবে। এ বইটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে বা বাসে চড়ে না পড়ে পড়ার টেবিলে রেখে পড়ুন। সাথে রাখুন খাতা আর রঙিন কলম। পরবর্তী অধ্যায়ে আপনার জন্য আছে বিশেষ চমক। আপনি কি প্রস্তুত? তা হলে চলুন না আমার সাথে অন্য ভুবনে।

অন্য ভুবন

আপনি হয়তো অনেক জায়গায় শুনে থাকবেন মানুষের ব্রেন কম্পিউটারের চেয়ে শক্তিশালী। কিন্তু, বাস্তবে আপনি তা দেখতে পাচ্ছেন না। কম্পিউটার যে কোন কাজ সম্পন্ন করছে আপনার চেয়ে অনেক দ্রুতগতিতে। এ ছাড়া, কম্পিউটারে যে তথ্য ঢুকানো হয় তা সংরক্ষিত থাকে বহুদিন। কিন্তু, আপনি যা পড়েন তা কিছুদিন পরেই ভুলে যান। আর যদি মনে থাকে, তবুও সেটা পরীক্ষায় লিখতে বা ভাইভা বোর্ডে মনে করতে অনেক সময় লাগে। এক প্রশ্নের জায়গায় অন্য প্রশ্নের উত্তর মাথায় চলে আসে। তা হলে, কম্পিউটারের চেয়ে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? এবার আসুন এ কথা জেনে নেই।

আমি পাঁচ বছর ঢাকা মেডিকেল কলেজে পড়েছি। নিউরোলজী নিয়ে সামান্য পড়েই যা জেনেছি তা বিস্ময়কর। আমি দুয়েকটা সহজ উদাহরণ দিচ্ছি। এই যে এখন আপনি শ্বাস নিচ্ছেন, এর মাধ্যমে অক্সিজেন সমৃদ্ধ বাতাস পৌঁছে যাচ্ছে ফুসফুসে। এ বাতাসের অক্সিজেন ফুসফুসের সূক্ষ্মনালিকা ভেদ করে রক্তের লোহিত কণিকা বা RBC-তে মিশে যাচ্ছে। একইসাথে দেহের অতিরিক্ত কার্বনডাই অক্সাইড (CO_2) RBC থেকে বাতাসের সাথে বের হয়ে আসছে। এখন এই (O_2) সমৃদ্ধ RBC ফুসফুস থেকে চলে আসল হার্টে। এরপর হার্ট পাম্প করে রক্তের মাধ্যমে দেহের সমস্ত কোষের কাছে (O_2)

পৌঁছে দেয় সুষমভাবে। অর্থাৎ, যে সব কোষে বেশি দরকার সেখানে বেশি, যেখানে কম দরকার, সেখানে কম। এ কাজ করে ফিরে আসবার সময় দেহের প্রত্যেকটা কোষের বিপাকক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্ট কার্বনডাই অক্সাইড (CO_2) কে রক্ত বহন করে নিয়ে চলে আসছে হার্টের ডান দিকে। আবার, পাম্পের মাধ্যমে তা ফুসফুসে গিয়ে রক্তের অতিরিক্ত (CO_2) ছেড়ে দিয়ে আসে। এ ঘটনা আপনার জীবনভর চলতে থাকে। এই RBC কী পরিমাণ (O_2) ধারণ করবে, দেহের কোন কোষে কতখানি (O_2) লাগবে তা নির্ণয় করে নানান রিসেপ্টর। এগুলোর প্রতিটা জবাবদিহি করে নিউরোরিসেপ্টরের কাছে। এদের সামান্য কোন গরমিল হলে সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে ব্রেনে খবর চলে যায়। তখন, ব্রেনের নির্দেশে শ্বাসপ্রশ্বাসের হার কমে যায় কিংবা বেড়ে যায়।

এবার, আরেকটু সহজ উদাহরণ দিই। ধরুন, আপনি দুপুরের খাবার খেয়েছেন। আপনি খাবার মুখে দেওয়া মাত্রই লালা নিঃসরিত হলো। আপনার দাঁত দিয়ে চিবিয়ে খাবারগুলোকে লালা মিশিয়ে ঠেলে দিলেন পাকস্থলীতে। এবার সেখানে এসিড (HCl) এর মাধ্যমে খাবারগুলো আরেকটু ভাঙল। কিছুক্ষণ পর খাবার পৌঁছাল ক্ষুদ্রান্ত্রে বা Intestine-এ। এখানে এসে প্রতিটি খাবার নির্দিষ্ট এনজাইমের মাধ্যমে মৌলিক উপাদানে ভাঙল। অর্থাৎ আপনি যে খাবারই খান না কেন তা ভাগ হবে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, লিপিড, ভিটামিন আর মিনারেলে। অখাদ্য খেলে সেগুলো সোজা বের হয়ে যাবে, হজম হবে না। এই মৌলিক উপদানগুলোকে শোষণ করবার জন্য আছে নির্দিষ্ট রিসেপ্টর। এ খাবার এখন রিসেপ্টরের সাথে জোড়া বেঁধে পৌঁছে গেল রক্তে। এবার তাকে দু'ধাপে বিশুদ্ধ করে যকৃত বা লিভার আর কিডনী। তারপর বিশুদ্ধ খাবারকে দেহের প্রতিটা কোষে সুষম ভাবে বণ্টন করে দেয়া হয়। যেমন–ব্রেনে পাঠানো হয় গ্লুকোজ, মাংসপেশীতে প্রোটিন। আপনার দেহের প্রয়োজন মিটিয়ে অতিরিক্ত খাবার

পরিণত হবে লিপিড বা চর্বিতে। আর তা জমা থাকবে আপনার দেহে পরবর্তীতে কাজে লাগবার জন্য। আর যা অপ্রয়োজনীয় তা বের হয়ে যাবে ঘাম আর মলমূত্র হিসেবে। খুব কি কঠিন লাগছে? তা হলে এবার বইটা রেখে আপনার ডান হাত দিয়ে চিমটি কাটুন বাম হাতে। টের পাচ্ছেন? কতক্ষণ লাগছে। আপনি স্পর্শ করার সাথে সাথেই Touch বা স্পর্শের অনুভূতি পৌঁছে যাচ্ছে ব্রেনে। চিমটি কাটলে যাচ্ছে pain Sensation. এবং এ অনুভূতি পৌঁছে গিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছে না। আপনার ব্রেন চিন্তা করছে কী করা যায়। যদি আপনি নিজে না হয়ে আপনার কোন বন্ধু চিমটি কাটত তা হলে, হয় আপনি হাত সরিয়ে নিতেন বা তাকেই চিমটি দিতেন। তা হলে, দেখতেই পাচ্ছেন সেকেন্ডের কয়েক ভগ্নাংশের মধ্যেই আপনি সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, কী করবেন।

আপনার এই শ্বাসপ্রশ্বাস, দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, খাবারকে কাজে লাগানো এসমস্তই নিয়ন্ত্রণ করছে ব্রেন, নিখুঁতভাবে। এবং আপনার সক্রিয় সাহায্য ছাড়াই। কোন সমস্যা হলেই তা আপনাকে সতর্ক করছে নানাভাবে। প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৩ বিলিয়ন বিক্রিয়া শরীরের বিভিন্ন কোষে সংগঠিত হয়। এগুলোকে যদি নিয়ন্ত্রণ করতে বলেন তা হলে, পৃথিবীর সর্বাধুনিক সুপারকম্পিউটারগুলোর কয়েক হাজারটাকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। তারপরও তা নিখুঁত হবার সম্ভাবনা মাত্র ১ ভাগ। তা হলে 'যায় যায় দিনে' প্রকাশিত পৃথিবীর সর্বাধুনিক সুপারকম্পিউটারের দাম যদি ৪০০০ কোটি টাকা হয় তা হলে আপনার ব্রেনের দাম কত!

আপনি কি অবাক হচ্ছেন? এতক্ষণ যে কাজের কথা বললাম তা তত্ত্বাবধানে ব্রেনের ২-৫ শতাংশ শক্তি খরচ হয়। বাকি ৯৫-৯৮ শতাংশ বসে আছে আপনার নির্দেশের অপেক্ষায়। দেখুন, আপনার চারদিকে। মোবাইল ফোন, টিভি, রকেট, সাবমেরিন এগুলো কারা বানিয়েছেন? যাঁরা বানিয়েছেন তাঁরা আমার আর

আপনার মতই মানুষ। তা হলে, তাঁরা যা পারেন আমরা তা পারি না কেন?

আরে ভাই, এ জন্যই তো আমি বইটা লিখছি। আপনিও পারবেন। এ বইয়ের বিষয়বস্তু সেটাই। এ বইয়ের অনুশীলন আপনার মেধাকে করবে শাণিত। আপনার কনফিডেন্স হবে আকাশছোঁয়া। আপনি গর্বভরে বলতে পারবেন, কে বলছে আমি পারি না! আমি পারি, আমি পারব। আর তাই আসুন এবার সাফল্যের শিখরে যাবার মূলমন্ত্রগুলো ধাপে ধাপে শিখে নিন পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে।

সাফল্যের কারণ

আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, অনেক শক্তিশালী আর ক্ষমতাসম্পন্ন একটা ব্রেনের মালিক আপনি। এবার তা হলে জেনে নিন আমাদের ব্রেন কীভাবে কাজ করে। আমাদের প্রত্যেকের মাথায় আছে ১০০০ বিলিয়ন নিউরন। তাদের প্রত্যেকে পরস্পরের সাথে প্রায় ১ হাজারটা সংযোগ ঘটাতে সক্ষম। আপনার সফলতা নির্ভর করে কোন নির্দিষ্ট কাজের জন্য আপনার কতগুলো কার্যকরী সংযোগ বর্তমান তার উপর। এ সংযোগ তৈরি হয় আপনি প্রথম কোন কাজ করবার সাথে সাথে। পরবর্তীতে যতবার সে কাজ করতে যাবেন, ততবারই প্রথম সংযোগ সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।

ধরুন, আপনি কোনদিন হিন্দি ছবি দেখেননি। একদিন

আপনার বন্ধুর সাথে টিভি দেখতে গিয়ে এক অনন্যা সুন্দরী নায়িকাকে দেখতে পেলেন। আপনি বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মেয়েটার নাম কী?' সে অবাক হয়ে বলল, 'কী বলিস? তুই ঐশ্বরিয়াকে চিনিস না!' তখন, আপনার দৃষ্টির মাধ্যমে ঐশ্বরিয়ার ছবি আপনার মেমোরীতে চলে গেল আর শ্রবণশক্তির মাধ্যমে জানলেন তার নাম ঐশ্বরিয়া। তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়াল এই যে, আপনি যা দেখলেন আর শুনলেন সে তথ্য দু'টো জমা হলো আপনার মেমোরীতে। আপনার দু'টো নিউরনের (দেখার ও শোনার) সাথে সংযোগ ঘটল তৃতীয় নিউরন বা মেমোরী নিউরনের সাথে। এবার, রাস্তার বিজ্ঞাপন হোর্ডিংয়ে আপনি তার ছবি দেখার সাথে সাথেই আপনার ব্রেনের নিউরোকানেকশন সক্রিয় হয়ে গেল। ফলে, আপনার মনে পড়ল এ মেয়েটার নাম ঐশ্বরিয়া। তারপর, কোন একদিন দু'জন ছেলেকে গল্প করতে শুনলেন, ঐশ্বরিয়ার নতুন ছবিটা দেখেছিস? তার নাম শোনামাত্রই আপনার মাথায় তার ছবি চলে আসল। এভাবে নিউরোকানেকশন তৈরি ও সমৃদ্ধ হতে থাকে। এখন যতবেশি তথ্য আপনি যতভাবে সংগ্রহ করবেন আপনার নিউরোকানেকশন ততটা পূর্ণতা লাভ করবে। ধরুন, আপনি এবার বিভিন্ন পত্রিকা পড়ে জানলেন ঐশ্বরিয়ার হিট ছবিগুলোর নাম, তার পারিশ্রমিক, এফেয়ার ইত্যাদি নানান তথ্য। এখন যদি কেউ আপনাকে ঐশ্বরিয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে আপনি তাকে অনেক তথ্য দিতে পারবেন। আমাদের জেনারেশনের ছেলেমেয়েদের মাথা এমন নানা হাবিজাবি তথ্যে পরিপূর্ণ। কিন্তু, সত্যিই কি তাই? এত চেষ্টা করে আপনি মাত্র ৩-৪টা নিউরনের মাঝে ৩০ টার মত কানেকশন তৈরি করেছেন। যেখানে আপনার ব্রেনে $(১০)^{১৪}$ টা সংযোগ সৃষ্টি সম্ভব।

আমাদের এই অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন নিউরনগুলো সর্বদা কাজ করতে চায়। আপনার হাতেই আছে তার কন্ট্রোল। আপনাকে শুধু নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে। আমাদের প্রত্যেকেই

পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত। আমাদের নিউরন সেট আপ ছোটবেলাতেই হয়ে থাকে। ফলে দেখা যায়, যারা ভাল রেজাল্ট করছে তারা সবসময়ই ভাল করছে। আর, খারাপ ছাত্ররা করছে খারাপ। কিন্তু, এর ব্যতিক্রম ঘটানোই আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়।

আমি ছোটবেলায় ক্লাসে ফার্স্ট হতাম। তারপর বাবার বদলি হবার পর নতুন স্কুলে এসে আমার রেজাল্ট ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। আমি অনেক চেষ্টা করেও দশের ভেতর ঢুকতে পারি না। আমার মনে হত আমার পক্ষে আর কোনদিন ভাল রেজাল্ট করা সম্ভব নয়। এসময় আমার মা আমাকে বললেন, এ বছর রেজাল্ট খারাপ হলে পরপর দু'বছর এ ক্লাসেই থাকতে হবে। এ কথা শুনেই আমার জেদ চেপে গেল। আমার বন্ধুদের ভাইয়া ডাকতে হবে আর জুনিয়র ছেলেদের সাথে পড়তে হবে এটা অসম্ভব। আমাকে ভাল রেজাল্ট করতেই হবে। সে বছর আমার তিন টার্মের ফলাফল ছিল ১০ম, ৫ম আর তৃতীয়। পরবর্তীতে SSC পরীক্ষায় আমার ক্লাসের তৃতীয় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছিলাম।

আমি তখনও এ নিউরোকানেকশন সম্পর্কে জানতাম না। তবুও নিজের অজান্তেই আমার মাঝে তা তৈরি হয়েছিল। আমার পক্ষে সম্ভব ছিল আরও ভাল করবার, যদি আমি এ বইটা তখন পড়তাম। কারণ ভাল ফলাফল লাভের জন্য দরকার সঠিক পরিকল্পনা আর তার বাস্তবায়ন। এখন তা হলে জেনে নিন এ বইটি কীভাবে পড়বেন–

সাধারণত চার ধরনের মানসিকতা নিয়ে মানুষ উন্নয়নমূলক বই পড়ে থাকেন।

১। একশ্রেণীর পাঠকরা এ কথা প্রমাণ করার জন্য পড়েন যে, এ বই পড়ে কোন লাভ হবে না। আগেও তাঁরা এ জাতীয়/এ ধরনের বই পড়েছেন যা কোন কাজে লাগেনি।

২। আরেক শ্রেণীর পাঠক এ মনোভাব নিয়ে পড়েন যে, একবার পড়েই দেখি কী আছে? তাঁরা শুধু বইটার পৃষ্ঠাগুলো উল্টে যান। অনুশীলনীগুলো বাদ দিয়ে পড়েন। বইয়ের কিছু মজার আইডিয়া পড়েন। এতে তাঁদের সামান্য মনোরঞ্জন হয়, তবে আখেরে কোন লাভ হয় না।

৩। অন্যশ্রেণীর পাঠকদের মনোভাব এই যে, কিছু অনুশীলনী চেষ্টা করে দেখা যাক। ফলে, তাঁরা খুব সামান্যই উপকৃত হন।

৪। আর সর্বশেষ শ্রেণীর পাঠক বইটা পড়েন একে সত্যিকার অর্থেই কাজে লাগানোর জন্য। তাঁরা বইয়ের মূল কনসেপ্টগুলো দাগিয়ে রাখেন। সবগুলো অনুশীলনী সম্পন্ন করেন এবং তার বাস্তব প্রয়োগ ঘটান। ফলে, তাঁরাই লাভ করেন সাফল্য।

তা হলে, আপনিই ঠিক করুন, কীভাবে বইটা পড়বেন?

কীভাবে কাজ করবেন

সাফল্যের মূল রহস্য হচ্ছে আপনি যে কাজে সফলতা চান তাতে আপনি কতগুলো নিউরোকানেকশন তৈরি করতে পারছেন তার উপর। তাই দরকার অনুসরণ। একজন সফল মানুষ যে পথে

চলেছেন সে পথ যদি আপনিও অনুসরণ করেন তা হলেই আপনি সফল হবেন। কিন্তু, আপনি কোনও আদর্শ খুঁজে পাচ্ছেন না। আপনার রয়েছে আত্মবিশ্বাসের অভাব। আপনি সফল হতে পারবেন কিনা, তা জানেন না। তা হলে আপনার জন্য দু'টি সত্যিকার উদাহরণ দিচ্ছি।

উদাহরণ-এক

১। তিনি জন্ম নিয়েছিলেন এক অশিক্ষিত পরিবারে।

২। তাঁর কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না।

৩। তাঁর কোন রোলমডেল ছিল না।

৪। তিনি তাঁর মাকে হারান ৯ বছর বয়সে।

৫। তিনি ব্যবসা করতে গিয়ে ব্যর্থ হন ২২ বছর বয়সে।

৬। তিনি উকিল হতে ব্যর্থ হন ২৩ বছর বয়সে।

৭। তিনি স্ত্রীকে হারান ২৬ বছর বয়সে।

৮। কংগ্রেসের পক্ষে নির্বাচনে দাঁড়ান এবং পরাজিত হন ৩৭ বছর বয়সে।

৯। ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনে ব্যর্থ হন ৪৭ বছর বয়সে।

১০। সিনেটর পদে নির্বাচনে ব্যর্থ হন ৪৯ বছর বয়সে।

এতগুলো ব্যর্থতার পর ৫১ বছর বয়সে তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করেন এবং বাকিটা ইতিহাস। এখন পর্যন্ত তিনিই আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেসিডেন্ট। তিনি আব্রাহাম লিংকন। লাগাতার ব্যর্থতা, প্রিয়জনের মৃত্যু কিছুতেই তিনি বিচলিত হননি। প্রতিটি ব্যর্থতা থেকে শিক্ষালাভ করে তিনি নিজের কর্মপদ্ধতি বদলেছিলেন এবং সর্বশেষে সফলতা পেয়েছেন।

উদাহরণ-দুই
[Ref: Street Urchin To talkshow Host extraordinary]

১। তিনি ১৩ বছর বয়সী একজন অবিবাহিতা আমেরিকান নিগ্রো মহিলার গর্ভ হতে জন্মেছিলেন।
২। তিনি বড় হয়েছেন রাস্তায়।
৩। মাত্র ১৩ বছর বয়সে এঁকদল সন্ত্রাসীর হাতে ধর্ষিত হন, যার ফলে জন্ম দেন এক মৃত শিশুর।

এ ভদ্রমহিলার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনি কতটা আশাবাদী? তাঁর একমাত্র গুণ ছিল সুন্দর করে কথা বলা। আর এই একমাত্র সম্পদকে কাজে লাগিয়ে ৪৬ বছর বয়সে আমেরিকার সফলতম সেলিব্রিটির খেতাবে ভূষিত হন। বার্ষিক আয়ের হিসেবে আমেরিকার ধনীদের তালিকায় তিনি ২৭ তম। বিশ্বে ৯১। তাঁর নাম অপরাহ উইনফ্রে।

আপনার অবস্থা কি তাঁর চেয়েও খারাপ! তা হলে তাঁরা যদি সফল হতে পারেন আপনি কেন পারবেন না। সাধারণত, কোন কাজে ব্যর্থ হলে আপনি তিনভাবে রিঅ্যাক্ট (React) করেন।

১। নিজেকে আর অন্যদের দোষ দেন এবং কাজটা আর করেন না

ধরুন, একটা পরীক্ষায় আপনার রেজাল্ট খারাপ হলো। এ কারণে কিছু দোষ দিলেন টিচারের উপর। তিনি ঠিকমত খাতা দেখেন না। কিছু দোষ দিলেন বন্ধুদের, তারা আপনাকে সাহায্য করেনি। আর কিছু দোষ চাপালেন নিজের উপর। কারণ, আপনি ঠিকমত পড়েননি। ফলে, পরবর্তীতে পরীক্ষা দেবার উৎসাহ পেলেন না।

২। আপনি বারবার একইভাবে চেষ্টা করেন

পরীক্ষায় খারাপ রেজাল্টের কারণে আপনি নিজেকেই দোষ দেন। একই পড়া একই পদ্ধতিতে আবার পড়েন। আগের চেয়ে ২ঘণ্টা বেশি পড়েন। তবুও, পরীক্ষার নম্বরের তেমন হেরফের হয় না। এভাবে, ধীরে ধীরে চলে যান ডিপ্রেশনে। ফলে, এরপর রেজাল্ট আরও খারাপ হতে থাকে। কিন্তু, এবার আর চেষ্টাও করেন না। কারণ, আপনার মনে বিশ্বাস এসে গেছে যে, আপনাকে দিয়ে এর চেয়ে ভাল রেজাল্ট হবে না।

৩। আপনি ভুল থেকে শিক্ষা নেন, নতুন নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করেন আর সবচেয়ে কার্যকরী পদ্ধতি মেনে চলেন এবং চেষ্টা করেন যতক্ষণ পর্যন্ত না সফল হচ্ছেন

এ তৃতীয় পদ্ধতিই হলো আপনার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। কারণ, সফল মানুষেরা প্রত্যেকেই এ পদ্ধতি ব্যবহার করেন। বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসন এ কথা বলেছিলেন, 'I hadnot failed, I had tried only a thousand ways that didnot work.'

আপনার ঘরে যে লাইট জ্বলছে তা আবিষ্কারের জন্য তিনি মাত্র ১০ হাজার বার চেষ্টা করেছিলেন। অবশেষে একটা গাছ থেকে সুতা বের করে তা দিয়ে বাল্ব বানিয়ে সফল হয়েছিলেন। এতেও যদি আপনি অনুপ্রাণিত না হন, তা হলে পড়ুন এক বিখ্যাত অভিনেতার জীবনী–

অতি দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম। আমেরিকার এক চার্চ স্কুলের সিঁড়িতে জন্ম নেবার সময় তাঁর মুখের ডানদিকের ফেসিয়াল নার্ভ ছিঁড়ে যায়। যার ফলে, আজীবন তাঁর কথা জড়িয়ে যায়। ডানদিক অবশ থাকার কারণে ছোটবেলায় তাঁর মুখ থেকে সর্বদা লালা ঝরত। একজন মানুষ যাঁর ডানদিক অবশ, যাঁর কথা অস্পষ্ট, যদি অভিনেতা হতে চান তা হলে যা হবার কথা, তাই হয়েছিল।

সবাই তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করত। তবে, তিনি ছিলেন ভীষণ একগুঁয়ে। তিনি অনেকগুলো অভিনয়ের স্কুলে অডিশন দিতে যান, কিন্তু কোথাও সুযোগ পান না। এর পর তিনি অডিশন দিতে গিয়ে চেয়ারে বসে বললেন, 'এ নাটকে আমাকে একটা পার্ট দিতেই হবে। না হলে আমি এ চেয়ার ছেড়ে উঠব না।' ঘণ্টাখানেক বসে থাকার পর পরিচালক বিরক্ত হয়ে তাঁকে দু'মিনিটের একটা দৃশ্যে অভিনয়ের সুযোগ দিলেন। এটাই ছিল তাঁর প্রথম সাফল্য।

ধীরে ধীরে তিনি বড় হলেন। বিয়ে করলেন। কিন্তু অভিনয়ের নেশা তাঁকে ছাড়ে না। এদিকে তিনি অভিনয় ছাড়া আর কোনও কাজ করতেও আগ্রহী নন। তাঁর স্ত্রী তাঁকে বহুবার বোঝালেন একটা চাকরী করতে। কিন্তু, তিনি বলেছিলেন, 'আমি আমার স্বপ্নকে বেচতে পারব না।' চাকরী করলে আমার বেঁচে থাকবার কোন মানেই থাকে না। তাঁর অবস্থা এত করুণ হয়েছিল যে, ছোটবেলার সাথী কুকুরটাকে তিনি বিক্রি করে দেন মাত্র ৫০ ডলারে।

এ চরম দুঃসময়ে তিনি দৈবক্রমে রাস্তায় একটি বক্সিং ম্যাচ দেখতে দাঁড়িয়ে যান। সেই লড়াইটা হচ্ছিল বিশ্বচ্যাম্পিয়ন মোহাম্মদ আলী আর চাক ওয়েপনারের (Chuck wepner) মধ্যে। সবাই ভেবেছিল ওয়েপনার তিন রাউন্ডের বেশি টিকবেন না। কিন্তু, ওয়েপনার হার মানেননি। অর্থাৎ, ১৫ রাউন্ড পর্যন্ত তিনি লড়াই চালিয়ে গেছেন।

এ ম্যাচ থেকেই তাঁর মাথায় আইডিয়া আসে একটা মুভির। দ্রুত বাসায় গিয়ে টানা ৮৪ ঘণ্টা ধরে তিনি লিখে ফেললেন তাঁর ছবির স্ক্রিপ্ট। লেখা শেষ করেই তিনি বুঝতে পারলেন এ ছবি তাঁর ভাগ্য বদলে দেবে।

কিন্তু, আবার শুরু হলো তাঁর ধৈর্যের পরীক্ষা। তিনি যাঁর কাছেই যান, কেউই বক্সিং নিয়ে ছবি বানাতে উৎসাহী নন।

অবশেষে একটি কোম্পানী তাঁর স্ক্রিপ্ট পছন্দ করে কপিরাইট হিসেবে ৭৫,০০০ ডলার দিতে চাইল। কিন্তু, তিনি শর্ত দিলেন ছবি মূল নায়কের চরিত্রে তাঁকে নিতে হবে। এ কথা শুনে ছবির পরিচালক ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন। তিনি সরাসরিই বলেন যে, 'তুমি নায়ক হলে এ ছবি কেউ দেখতে আসবে না।' পরিচালক স্ক্রিপ্টের দর বাড়াতে লাগলেন। একসময় ১ মিলিয়ন ডলার দাম উঠল। যদিও তিনি ও তাঁর পরিবার না খেয়ে, না পরে আছেন, তবুও তিনি স্ক্রিপ্ট বেচলেন না।

এরপর, পরিচালক বিরক্ত হয়েই তাঁকে নায়ক বানালেন। কিন্তু, গল্পলেখা আর অভিনয় বাবদ সর্বমোট ৩৫,০০০ ডলার তাঁকে দেওয়া হলো। আর, যদি লাভ হয় তা হলে তাঁর পার্সেন্টেজ তিনি পাবেন। তিনি এতেই রাজী হয়ে গেলেন।

টাকা নিয়ে প্রথমেই গেলেন তাঁর কুকুরটাকে ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু, ক্রেতা ভদ্রলোক কুকুরটাকে বিক্রি করতে আগ্রহী নন। এবার তিনি দর বাড়ানো শুরু করলেন। ১০০ ডলার, ৫০০ ডলার...। কিন্তু, সে লোক বেচবেই না। আপনাদের আমি আগেই বলেছি তিনি হার মানতে মোটেই রাজী নন। অবশেষে ১৫,০০০ ডলার আর তাঁকে মুভিতে অভিনয়ের সুযোগ দিয়ে তিনি কুকুর নিয়ে বাসায় ফিরলেন। তাঁর নাম সিলভেস্টার স্ট্যালোন। তাঁর এ ছবির নাম 'রকি'।

'রকি' যখন বক্সঅফিসে আসল সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ছবিটির নির্মাণ ব্যয় ছিল ১ মিলিয়ন ডলার। আর তা আয় করেছিল ১৭১ মিলিয়ন ডলার।

'রকি' মোট ১০টি বিভাগে অস্কার নমিনেশন পায়। (সেরা অভিনেতাসহ) আর অস্কার পেয়েছিল দু'টি। শ্রেষ্ঠ পরিচালক ও শ্রেষ্ঠ ছবি বিভাগে। স্ট্যালোন এরপর একে একে First Blood, Rambo আর Rockey'র সিকুয়েলে অভিনয় করেন এবং ৮০-৯০-এর দশকের সবচেয়ে জনপ্রিয় নায়ক হিসেবে বিশ্বব্যাপী

পরিচিতি পান।

তাই, কোন কাজ করবার সময় বাধা প্রাপ্ত হলে সর্বদা তাঁর অমর বাণী মনে রাখুন।

"when you are committed enough, there is always a way." তাই, আপনিও তাঁর মত আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে চলুন পরবর্তী অধ্যায়ে।

বিশ্বাস

'বিশ্বাস করুন, আমাকে দিয়ে কিছু হবে না। আমি সামান্য পরিশ্রমেই ক্লান্তি বোধ করি। আমার বাসার সবাই জানে আমার ব্রেন ভাল না। আমি ছোটবেলা থেকেই এমন দেখে আসছি।'

আপনি কি জানেন, বিশ্বাস একটা মজার ব্যাপার! আপনাকে আমি যে নিউরোকানেকশনের কথা প্রথমে বলেছি সেটাই তৈরি করে বিশ্বাস। ধীরে ধীরে তা পূর্ণতা লাভ করে আর আপনার মাঝে জেঁকে বসে। ধরুন, ক্লাস ওয়ানে পড়বার সময় আপনি অংকে কম নম্বর পেয়েছেন। আপনার টিচার বললেন, 'তুমি তো অংকে ভাল না।' আপনার প্রথম নিউরোকানেকশন তৈরি হলো। বাসায় রেজাল্ট দেখার পর বাবা বললেন, 'ধুর! তুই তো অংকে গোল্লা।' আপনার এ কানেকশন সমৃদ্ধ হলো। মা বললেন, 'আমিও অংকে খুব একটা ভাল ছিলাম না।' এ থেকে আপনার বিশ্বাস জন্মালো, আপনার পক্ষে

অংকে ভাল করা সম্ভব নয়। কারণ, এটা আপনার জন্মসূত্রে পাওয়া। এরপর যখনই অংক করতে যান, আপনার মাঝে বিতৃষ্ণা আর ভয় কাজ করে। আপনি সহজ অংক ভুল করে বসেন। কঠিনগুলো এড়িয়ে যান। আরেকটু বড় হলে এমন বিষয় নিয়ে পড়েন যাতে অংক করতে না হয়। মজার ব্যাপার হলো, আপনার এ বিশ্বাস হাওয়া থেকে আসেনি। আপনার পরিবার, বন্ধুবান্ধব, সমাজই আপনার মাঝে এ বিশ্বাস তৈরি করে দিয়েছে। এর বাস্তব একটি ঘটনা আমি উল্লেখ করছি–

এডাম সিংগাপুরের একজন মাল্টিমিলিওনিয়ার। তিনি মাত্র ২৬ বছর বয়সে পৃথিবীর শীর্ষ দশ বক্তার মধ্যে চলে আসেন। আপনি যদি ভাবেন, বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের মত বক্তা আর কে আছে! বক্তৃতা দেওয়া এমন কী ব্যাপার! তা হলে শুনুন, এডাম তাঁর প্রতি ১ ঘণ্টার বক্তৃতায় পান ৫০ হাজার ডলার। তাঁর লেখা বই, 'I am gifted, So are you.' থেকে আমি ঘটনাটা বলছি।

এডাম স্কুলে থাকতে অংকে খুবই খারাপ ছিলেন। তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল এ জীবনে আর অংকে ভাল করা সম্ভব নয়। এমন সময়, তিনি স্কুল থেকে একটি 'Self learning Tour'-এ যোগ দেন। সেখানে তাঁকে বলা হয়, 'আপনি চেষ্টা করলেই যে কোন বিশ্বাস ভাঙতে পারবেন এবং তৈরিও করতে পারবেন। তাই সবার উচিত, ক্ষতিকর বিশ্বাস মন থেকে মুছে ফেলা আর লাভজনক বিশ্বাস গড়ে তোলা।'

এডাম ঠিক করলেন, আমি অংকে ভাল না এ বিশ্বাস ভাঙতেই হবে। তখন তিনি সবেমাত্র কলেজে ঢুকেছেন। প্রথম ক্লাস শুরুর আগেই অংক বই কিনে প্রথম চ্যাপ্টারটা বাসায় পড়ে প্রতি নিয়মের একটা করে অংক করেছেন। নতুন

জায়গায়, অপরিচিত পরিবেশে তাঁর অংক ক্লাস শুরু হলো। কিছুক্ষণ পরেই, সবার মনোযোগ নানানদিকে চলে গেল। কিন্তু, এডাম মনোযোগী ছিলেন। ক্লাস শেষ হতে ১৫ মিনিট বাকি। এমন সময় সার বললেন, 'এতক্ষণ তোমাদের যে নিয়মটা শেখালাম তার একটা অংক বোর্ডে লিখে দিয়েছি। কে করতে পারবে হাত তোল।' অংকগুলো আগে করা থাকায় এডাম আরও ভাল বুঝতে পারছিলেন আর তাই দেখা গেল ক্লাসে মাত্র একটা ছেলে হাত তুলেছে। তারপর, বোর্ডে গিয়ে অংকটা করার সাথে সাথে পুরো ক্লাসে হাততালি। সবাই বিস্মিত। প্রথম দিনই তাঁর নাম হয়ে গেল Math genius. এ হাততালি আর বন্ধুদের মুগ্ধদৃষ্টি পাওয়ার জন্য তিনি প্রত্যেক ক্লাসের আগেই অংক করে ফেলতেন আর ক্লাসে নিয়মিত বোর্ডে অংক করতেন। তাঁর টিচাররাও তাঁর পারফর্মেন্সে বিস্মিত হয়ে বলে ফেললেন, 'তুমি আসলেই একজন Math genius।' এখন যত কঠিন অংকই হোক বন্ধুরা এডামের কাছে চলে আসে। কারণ, এডাম তা পারবেই।

তা হলে, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আপনি যা বিশ্বাস করেন তা একটা কাল্পনিক ব্যাপার। আপনার কল্পনাকে যদি বদলাতে পারেন তা হলে আপনিও হয়ে যেতে পারবেন একজন রোলমডেল।

এখন তা হলে একটা খাতা নিয়ে বসুন। খাতাতে স্কেল দিয়ে সমান দূরত্বে তিনটি দাগ দিয়ে চারভাগ করুন। তারপর নীচের মত একটা চার্ট বানান। আপনার যত ক্ষতিকর বিশ্বাস আছে তা লিখুন আর তা কেন সত্যি নয় এবং আপনার নতুন বিশ্বাস লিখুন। নীচে একটি মাত্র উদাহরণ দেওয়া হলো।

আমার ক্ষতিকর বিশ্বাস	এ বিশ্বাস মিথ্যা কারণ	এটা তৈরি হয়েছে কারণ	আমার নতুন বিশ্বাস
১। আমার স্মৃতিশক্তি খারাপ	১। আমি নতুন ২০ টা হিন্দি গানের প্রথম লাইন মনে রাখতে পারি ২। আমি ক্রিকেটের স্কোরকার্ড মুখস্থ বলতে পারি মাত্র একবার দেখেই।	১। আমি সঠিক পদ্ধতিতে পড়ি না ২। আমি পড়ার সময় নানা জিনিস চিন্তা করি।	(ক) আমার স্মৃতিশক্তি অসাধারণ।

এবার আরেকটা চার্ট করুন

আমার ক্ষতিকর বিশ্বাস	এর প্রভাব
১। আমার স্মৃতিশক্তি খারাপ	(১) আমি পড়া মনে রাখতে পারি না। তাই বাজে রেজাল্ট করি
	(২) বাসায় সবাই আমাকে করুণা করে।
	৩) বন্ধুরা আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে।

এখন আরেকটি চার্ট করুন:

আমার নতুন বিশ্বাস	উদাহরণ
১। আমার স্মৃতিশক্তি ভাল।	(১) আমার অনেক বন্ধুর মোবাইল নম্বর আমার মুখস্থ আছে।
	(২) আমার বাসায় টিভিতে কত নম্বরে কোন্ চ্যানেল আছে তা আমার মুখস্থ।

একজন সফলছাত্রের ৫ টি বিশ্বাস

১। যদি কিছু বদলাতে হয় প্রথমে নিজেকে বদলাতে হবে।

২। ব্যর্থতা বলে কোন কথা নেই। বাজে রেজাল্ট মানে পরবর্তীতে ভুল না করার জন্য শিক্ষা।

৩। যদি অন্যেরা পারে, তা হলে আমিও পারব।

৪। পড়ালেখা হলো একটা চ্যালেঞ্জ এবং আমি তা জিতব।

৫। পরিবর্তনের সাহসই আমার মূল শক্তি। আমি সবসময় নতুনকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকব।

তাই, আপনিও এতে বিশ্বাস রাখুন। কারণ, আমার এ বই আপনার হাতে আসার পর হয়তো আরও নতুন পদ্ধতিতে পড়ার নিয়ম আবিষ্কার হয়ে যাবে। এরমধ্যে যেটা আপনার জন্যে সবচেয়ে কার্যকর তা গ্রহণ করবার শক্তি রাখুন। এবার আমি জানতে চাই, আপনি কি সত্যিই সফলতা চান?

আপনি কি সত্যিই সফলতা চান?

পড়ার কৌশলগুলো আয়ত্ত করবার আগে আপনাকে জানতে হবে, আপনি সত্যিই সফলতা চান কিনা? আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন, কে না সফলতা চায়! সব্বাই চায় সফল হতে।

দুঃখের বিষয় হলো, ৯৫ ভাগ লোকেরই সফল হতে চাওয়াটা শুধু চাওয়াতেই সীমাবদ্ধ। তাঁরা চান মাঝে মাঝে পড়ালেখা করব, টিভি-সিনেমা দেখব, আড্ডা দেব, গান শুনব, গল্পের বই পড়ব। তারপর যদি A+ না পাই তা হলে কী আর করা! জীবনটাকে তো উপভোগ করতে হবে।

আর, বাকি ৫ ভাগ চিন্তা করেন, আমাকে A+ পেতেই হবে আর তার জন্য যা দরকার, আমি তাই করব। যদি প্রয়োজন পড়ে, তা হলে টিভি দেখব না, আড্ডা দেব না, খেলব না। দিনে যদি ১০ ঘণ্টা পড়তে হয় পড়ব। যদি নতুন নিয়মে পড়তে হয় পড়ব। তারপর সময় থাকলে বিনোদনের কাজে লাগানো যেতে পারে।

আপনার কী ধারণা? কোন্ ছেলেটা A+ পাবে? বেশিরভাগ ছাত্রই জীবনে সফল হতে চান কিন্তু, তাঁরা ভাবেন সফলতা এমনি এমনিই আসে। তাঁদের সবার অভিযোগগুলো মোটামুটি একইরকমের। বাসায় পড়ার পরিবেশ নেই। টিচার ভাল না, প্রশ্ন কঠিন, আমার মেমোরী খারাপ ইত্যাদি। আপনারও যদি এমন অজুহাত দেবার প্রবণতা থাকে তা হলে এখনই তা ত্যাগ করুন। কারণ এ বই পড়েও আপনি বলবেন এ বই আমার জন্য নয়।

এটা জিনিয়াসদের জন্য।

তাই, এখন থেকে নিজের সমস্ত দায়িত্ব নিজে নিন। আপনি নিজেকে বলুন, আমার বাজে ফলাফলের জন্য আমিই দায়ী। রেজাল্ট ভাল হলে সেটা আমারই কষ্টের ফল। আমি যে রেজাল্টই করি না কেন এর চেয়ে ভাল বা খারাপ আমি করতে পারি।

আমি সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতি অস্বীকার করছি না। তবে, তিনিই বলেছেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন জাতি নিজের ভাগ্য বদলের চেষ্টা করে, আমি তাদের ভাগ্য বদল করি না।' তাই, নিজের কাজের দায়িত্ব নিজে নিন। বিশ্বাস করুন, আপনার ভাগ্য আল্লাহ আপনারই হাতে দিয়েছেন। আপনি উদ্যোগ না নিলে তিনি কখনোই সাহায্য করবেন না।

'সফল হবার জন্য বর্তমানে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু, এতে নিজের উপর তৈরি হয় প্রচুর স্ট্রেস। ধরুন, একটা পরীক্ষায় সজীব আপনার চেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে। আগামী পরীক্ষায় তাকে হারাতেই হবে। এবারের পরীক্ষায় আপনি সজীবের চেয়ে বেশি পেয়েছেন। কিন্তু, এবার আপনার চেয়ে বেশি পেয়েছে কাওসার। এভাবে, লড়াই করলে দেখতে পাবেন, আপনি খুবই নগণ্য একজন। আপনি যত ভাল ফলাফলই করুন, কেউ না কেউ কোনভাবে আপনার চেয়ে এগিয়ে থাকবে। আপনার একার পক্ষে সবাইকে হারানো অসম্ভব। হয়তো আপনি ক্লাসের ফার্স্টবয়, তবে, অন্য স্কুলের ফার্স্টবয় হয়তো আপনার চেয়ে বেশি জানে। অন্যদিকে, হয়তো আপনি সাইন্সের ছাত্র। তা হলে, কমার্সের যে কোন সাধারণ ছাত্র তার সাবজেক্টে আপনার চেয়ে বেশি জানে। তা হলে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে কী করবেন?'

ফাদার বেঞ্জামিন ডি কস্টা নটরডেম কলেজের প্রিন্সিপাল। তিনি খুবই সাধারণ পোশাক পরতেন। তাঁর কথাবার্তায় ছিল আঞ্চলিকতার টান। কিন্তু, যখন তিনি বক্তৃতা দেন তা সবার হৃদয়

স্পর্শ করে যায়। অনেক শুদ্ধভাষায় কথার ফুলঝুরি ফোটানো বক্তৃতাও তাঁর সরল গ্রাম্যভাষায় বক্তৃতার কাছে ম্লান হয়ে যায়। আমাদের HSC প্রথম বর্ষের ফলাফল বের হবার পর ছাত্র, অভিভাবক ও শিক্ষকদের মিটিং হয়। কীভাবে পড়ার মান আরও বাড়ানো যায় তা জানতে অভিভাবকদের পরামর্শ চাওয়া হয়। একজন অভিভাবক বলেন, ছাত্রদের রিপোর্ট কার্ডে যদি তাদের প্রাপ্ত নম্বরের পাশে শ্রেণীর সর্বোচ্চ নম্বর লিখে দেওয়া হয় তা হলে খুব ভাল হয়। এরপর ফাদার বেঞ্জামিন উপরোক্ত কথাগুলো বলেছিলেন। এরপর তিনি আরও বলেন, 'জীবনে সফল হতে হলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে শুধুমাত্র নিজের সাথে, নিজের অতীতের সাথে। ধরুন, ফার্স্ট টার্মে আপনি গড়ে ৭০% নম্বর পেয়েছেন। সেকেন্ড টার্মে আপনাকে এর চেয়ে ভাল করতে হবে। কখনোই অন্য কারও সাথে তুলনা করবেন না। কারণ, তা হলে আপনার মধ্যে জন্ম নেবে হতাশা, ঈর্ষা, ক্ষোভ। সবসময় লড়াই করুন নিজের সাথে।'

হযরত মুহাম্মদ (সা:) এ সম্পর্কে বলেন, 'সে ব্যক্তি হতভাগ্য যার আজকের দিনটি গতকালের চেয়ে ভাল যায়নি।'

তাই প্রতিদিন নিজের পারফর্মেন্স বাড়ানোর চেষ্টা করুন। নিজের সাথে লড়াইয়ের মজা হলো, নিজেকে হারানোতে বা নিজের কাছে হারতে লজ্জার কিছু নেই।

ভাল রেজাল্টের রহস্য

ভাল ছাত্রঃ সাধারণ ছাত্র–একই ব্রেনঃ ভিন্ন পদ্ধতি

আগের অধ্যায়গুলো পড়াতে আপনি বুঝতে পারছেন যে, আপনার সাথে একজন জিনিয়াস ছাত্রের তেমন কোন তফাৎ নেই। আপনারও আছে সমান প্রতিভা। তা হলে, আপনি ভাল করতে পারছেন না কেন? আপনি হয়তো দেখেছেন, মেধাবী ছাত্ররা খুব দ্রুত পড়া বুঝতে পারে। কোন কঠিন অংক সহজেই সমাধান করে ফেলে। এর কারণ কী? আচ্ছা, তা হলে আপনি আমাকে বলুন তো, পরীক্ষার ঠিক কতদিন আগে আপনি পড়া শুরু করেন? আপনি কোন্ পদ্ধতিতে পড়েন? আপনি কয় ধাপে পড়া তৈরি করেন?

এই তিনটা প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন ছাত্রের বিভিন্নরকম হবে। তবে, তাঁদের অধিকাংশই পরীক্ষার ১ মাস থেকে ১ দিন আগে পড়া শুরু করেন। তাঁদের পদ্ধতি হলো ঝাড়া মুখস্থ করা। আর, তাঁরা এক ধাপে বা তিন ধাপে পড়া তৈরি করেন। যেমন–

১. কিছু ছাত্র দুই ধাপে পড়েন (৫০%)

ক. তাঁরা পাঠ্যবই বা নোটবই পড়েন

খ. পরীক্ষা দিতে চলে যান।

এঁদের রেজাল্ট হয় পাসফেলের মার্জিন বরাবর।

২. তিন ধাপে পড়েন (৩৫%)
ক. এঁরা পাঠ্যবই আর নোট বই পড়েন।
খ. কিছু প্রশ্ন মুখস্থ করেন।
গ. পরীক্ষা দিতে যান।
তাঁরা C বা D গ্রেড পান।

৩. চার ধাপে পড়েন (১২%)
ক. এঁরা পাঠ্যবই আর নোট বই পড়েন।
খ. পড়া মুখস্থ করেন।
গ. বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর বাসায় লিখে প্র্যাকটিস করেন।
ঘ. পরীক্ষা দিতে যান।

এঁরা B গ্রেড স্টুডেন্ট। খুব সিরিয়াস হলে তাঁরা A পেয়ে যান। তা হলে, নিশ্চয়ই আপনার জানতে ইচ্ছে করছে বাকি ৩% ছেলে যাঁরা নিশ্চিতভাবেই A + পান তাঁরা কীভাবে পড়েন?

এর জন্য দরকার ৯টি ধাপ এবং প্রতিটি পরীক্ষার কমপক্ষে তিনমাস আগে পড়া শুরু করা। এবং ক্লাসের প্রথমদিন থেকেই পড়া শুরু করা। এখন তা হলে আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি এ ৯টি ধাপ কী কী—

ধাপঃ ১-খুবই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য তৈরি করা

বেশিরভাগ ছাত্রই মনে করেন, পড়া শুরু করে দিলেই হলো। পড়া চলতে থাকবে। এতে দেখা যায়, কিছুদিন কিংবা কয়েকঘণ্টা পড়েই পড়ার কোন উৎসাহ থাকে না। এর কারণ হলো লক্ষ্যহীনতা। কাজেই, প্রথমেই আপনাকে লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট করতে হবে।

আবার অনেকেই ভাবেন, ধীরে ধীরে উন্নতি করব। সামনের পরীক্ষায় ৭০, তারপরে ৮০ এভাবে বাড়াতে হবে। খুবই বাজে

ধারণা। কারণ তা হলে একটা পরীক্ষায় খারাপ করলেই হতাশা চলে আসবে। ধরুন, আপনি অংকে ৬০ পাবার লক্ষ্য নিয়ে পড়া শুরু করলেন। তা হলে, আপনি কীভাবে পড়বেন? আমি বলি? আপনি সোজা অংকগুলো করবেন পরীক্ষায় ৫টা চ্যাপ্টার থাকলে ২টা চ্যাপ্টার আপনি বাদ দেবেন। ফলে, দেখা যায় পরীক্ষায় সেই দুটো চ্যাপ্টারের প্রশ্ন আসলে চোখে অন্ধকার দেখেন। আর, লক্ষ্য যদি কম থাকে, তা হলে আপনার অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন ব্রেন অলস বসে থাকে। তাই, আপনি ৫০-এর বেশি পাবেন না। এদিকে যদি আপনার লক্ষ্য থাকে ১০০ নম্বর পাওয়া, তা হলে আপনার ব্রেন থাকবে সজাগ ও সজীব। সে তার সমস্ত ক্ষমতা ব্যয় করবে পড়ালেখার পেছনে। কোন তথ্যই সে ছেড়ে দিতে চাইবে না। একটা বাস্তব উদাহরণ দিই। এখনই আপনার লক্ষ্য ঠিক করুন, এ বইয়ের তথ্যগুলোকে আমি সম্পূর্ণ, মানে ১০০ ভাগ মনে রাখব। এখন দেখুন, এ লাইনটা আপনি পড়ার সময় আপনার মনোযোগ কতটা বেড়ে গেছে। লক্ষ্য ঠিক করুন যে, জরুরী তথ্যগুলোকে আপনি লাল কালি দিয়ে দাগ দিয়ে রাখবেন। কোন প্রয়োজনীয় তথ্য যেন না দাগানো অবস্থায় না থাকে। লক্ষ্য কীভাবে ঠিক করবেন তা নিয়ে সম্পূর্ণ একটা অধ্যায় আছে। তা পড়বার আগে জেনে নিন দ্বিতীয় ধাপটি।

ধাপ: ২-পরিকল্পনা

আপনার লক্ষ্য চমৎকার হতে পারে, তবে তা বাস্তবায়নের জন্য দরকার সঠিক পরিকল্পনা। এ বিষয়ে জানতে পারবেন পরিকল্পনা অধ্যায়ে।

ধাপ: ৩-সবসময় সক্রিয়তা

প্রত্যেকেই লক্ষ্য আর পরিকল্পনা করতে পারেন। কিন্তু, তা বাস্তবায়নে দরকার সক্রিয়তা। আমি আগে গাদাগাদা কাগজ নষ্ট

করেছি কী পড়ব, কখন, কীভাবে পড়ব, এসব লিখে। কিন্তু, কোনটাই মেনে চলতে পারিনি। তাই, সক্রিয়ভাবে পড়ালেখার উপায় জানতে হবে। এর বর্ণনা আছে মোটিভেশন অধ্যায়ে।

ধাপ: ৪-পাওয়ার রিডিং

বর্তমানে উন্নতবিশ্বের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে Power Reading-কে উৎসাহ দেয়া হচ্ছে। এ পদ্ধতিতে মূল তথ্যগুলোকে আলাদা করে ফেলা হয়। Power Reading অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে জানতে পারবেন।

ধাপ: ৫-Super Memory

আপনারা যাঁরা ভেবে থাকেন, মুখস্থ করা বাজে জিনিস তাঁদের জন্যই রয়েছে Super Memory-র নিয়মকানুন। আপনার যা মনে রাখতে হবে তাকে নানাভাবে সাজিয়ে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারের পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে Super Memory অধ্যায়ে।

ধাপ: ৬-Mind Mapping ®

Mind Mapping (R) এর আবিষ্কর্তা Tony Buzan. তাঁর এ আবিষ্কার পড়ালেখায় বিপ্লব সাধন করেছে। অনেক বিদেশী বইয়ে চ্যাপ্টারের শেষে লেখা থাকে উপদেশ হিসেবে Mind Map (R) তৈরি করার। এর মাধ্যমে প্রায় ১০ পৃষ্ঠার তথ্যকে ১ পৃষ্ঠায় নিয়ে আসা সম্ভব। আর তা মনে রাখাও সম্ভব। মনে রাখার ক্ষমতার উপর Tony Buzan একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন প্রতিবছর। গতবছরের প্রতিযোগিতার একটা বিষয় ছিল প্রত্যেক প্রতিযোগীকে দু'মিনিট একটা হলরুমে দেখতে দেয়া হয়। সেখানে ২৫০টি ভিন্ন আইটেম সাজানো আছে। দু'মিনিট পর তাকে ১৫ মিনিট সময় দেয়া হয় Mind Map (R)

বানানোর। গত বছরের বিজয়ী ২৪১টি আইটেমের নাম সঠিক লিখতে পেরেছেন। এ বিচিত্র মনে রাখার পদ্ধতি আমি নিজে ব্যবহার করেও অবাক হয়েছি। কারণ, এটা তৈরি করলে কোন তথ্য ভুলে যাওয়াই কঠিন। আর রিভিশন দেয়া এতটাই সহজ হয় যে, পরীক্ষার আগের রাতে আপনি মনের সুখে মাসুদ রানা পড়তে পারবেন। Mind Mapping (R) শিখতে হলে অবশ্যই আগের দু'টো ধাপ জানতে হবে। এর বর্ণনা আছে Mind Mapping (R) অধ্যায়ে।

ধাপ: ৭ মেমোরীকে কাজে লাগানো

ধাপ: ৮ পরীক্ষার প্রস্তুতি

ধাপ: ৯ পরীক্ষা দেয়ার পদ্ধতি

আপনাকে ভাল ফলাফল নিশ্চিত করতে হলে এ ৯টি ধাপ অনুশীলন করতে হবে। এখন তা হলে আপনাকে জানাচ্ছি বিশ্বব্যাপী রিসার্চের মাধ্যমে প্রাপ্ত, পড়ালেখার বাধা হিসেবে চিহ্নিত প্রধান ১৫টি কারণ–

১. দুর্বল স্মৃতিশক্তি
২. সিদ্ধান্তহীনতা
৩. অলসতা
৪. টিভি, কম্পিউটার, খেলাধুলা ও গানে আসক্তি
৫. ক্লাসের পড়া বুঝতে না পারা
৬. সহজেই মনোযোগ হারিয়ে ফেলা
৭. ক্লাসে দিবাস্বপ্ন দেখা
৮. পরীক্ষাভীতি
৯. সহজ জিনিস ভুল করা

১০. বাবা-মা কর্তৃক অতিরিক্ত চাপ প্রদান ও বিশাল আশা
১১. পড়ার তুলনায় সময় কম
১২. উৎসাহের অভাব
১৩. সহজেই হাল ছেড়ে দেয়া
১৪. বিরক্তিকর শিক্ষক
১৫. বিরক্তিকর বিষয়।

এর মাঝে অনেকগুলো আপনার মাঝেও আছে, তাই না? এখন আপনি যত সামনের দিকে পড়বেন, আপনার যে সমস্যাগুলো সমাধান হয়ে যাচ্ছে তাতে ক্রসচিহ্ন দেবেন। এ বই পড়া শেষে ১৫ টাতেই যেন ক্রস দিতে পারেন সেই কামনা করছি।

ভাল রেজাল্টের পেছনে বাবা-মার ভূমিকা

২০০৬ সালের S.S.C. রেজাল্টের পর জি.পি.এ. ৫ পাওয়া একজন মেয়ে বলেছিল, 'এবার যদি আমার মা আমার সাথে পরীক্ষা দিত, তা হলে সেও জি.পি.এ-৫ পেত। কারণ, আমাকে পড়ানোর আগে মা সব পড়ে ফেলত।' আমার মতে এতটা না হলেও বাবা অথবা মা কোন একজনের গাইড করাটা জরুরী। একজন মা-ই হতে পারেন আদর্শ গাইড। আমার নিজেদের পরিবারের কথা বলি। আমরা চার বোন, দুভাই। আমি সবার ছোট। আমার বড়বোন আমার চেয়ে মাত্র ৮ বছরের বড়। এই ৬ সন্তানকে মা একসাথে পড়াতেন। প্রতিদিন ভোরবেলায় নামাজ পড়ে ১ ঘণ্টা পড়তাম। দুপুরে বাসায় এসে ১ ঘণ্টা ঘুমের পর আবার ১ ঘণ্টা। বিকেলে ঘণ্টাখানেক বাইরে খেলাধুলা করে মাগরিবের আজানের পর ২ ঘণ্টা পড়ে একঘণ্টা ব্রেক পেতাম। খাওয়াদাওয়া করে ঘুমানোর আগে স্কুলের হোমওয়ার্ক করতে হত। যখন অন্যান্য আন্টিরা সন্ধ্যায় হাঁটতে যেতেন, ক্লাবে বা কারও বাসায় ঘুরতে যেতেন, আমার মা যেতেন না। সপ্তাহে একটা

ধারাবাহিক নাটক দেখতে পেতাম। আর শুক্রবারে কার্টুন দেখতাম। সবসময় ভাবতাম, কবে বড় হব! আমরা কোথাও পড়তে গেলে সেখানে ফোন করে খবর নিতেন। কী কী পড়ানো হলো সেগুলো বাসায় এসে বলতে হত। সাধারণত নভেম্বরের মাঝামাঝি ক্লাসের ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হয়ে যেত। কিছুদিন আমরা বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে যেতাম। তারপর, ডিসেম্বরের ৫-৬ তারিখ থেকেই পরবর্তী ক্লাসের পড়া শুরু করে দিতাম। ফলে, ক্লাস শুরু হবার আগেই প্রথম সাময়িক পরীক্ষার অধিকাংশ পড়াই শেষ হয়ে যেত। তাই, স্কুলের সবাই আমাদের ভাইবোনদের মেধা দেখে অবাক হয়ে যেত। এটা আমাদের সব ভাইবোনদের উপর চাপ সৃষ্টি করে ভাল রেজাল্ট করার। আমার বড় দু'বোন ডাবল স্ট্যান্ড করে S.S.C ও H.S.C. তে। তারা দু'জনেই ডাক্তার। সেজো আপু (BUET) বুয়েট থেকে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। ছোট আপু ঢাকা ভার্সিটি থেকে ফিশারিজে মাস্টার্স। আর আমরা দু'ভাই ডাক্তার।

এখন আমরা বুঝতে পারি যে, ছোটবেলার সেই কড়া শাসন না থাকলে হয়তো আমরাও আমাদের অনেক বন্ধুর মত ড্রাগ এডিক্টেড হয়ে পড়তাম। আমার মা'র এই আত্মত্যাগ, কঠোর শাসন আর বাবার সাপোর্টে আমরা আজ প্রতিষ্ঠিত। একজন মা'কেই বুঝতে হবে সন্তানদের কখন আর কতটুকু ছাড় দিতে হবে। আর কখন তাকে সাপোর্ট দিতে হবে।

এখন তা হলে চলুন পরবর্তী অধ্যায়ে।

আপনার অনন্য ব্রেন

আমার অনেক সৌভাগ্য যে, আমি এমন কিছু ছাত্রের সাথে পড়েছি যারা সত্যিকারের জিনিয়াস। কোন একটা জটিল বিষয় তারা মাত্র একবার পড়েই এত সুন্দর ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম যে, যে কেউই অবাক হয়ে যাবে। কিন্তু, তাদের এরকম জিনিয়াস হওয়াটাও হুট করে হয়নি। তারা তাদের ব্রেনকে সঠিক পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বর্তমান অবস্থায় এসেছে। আপনার পক্ষেও এটা করা সম্ভব। আর, এ সত্য প্রমাণ করেছিলেন আমেরিকার এরন স্টার্ন।

তিনি বিশ্বাস করতেন, যদি সঠিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তা হলে ব্রেনের ক্ষমতাও বাড়ানো সম্ভব। এ জন্য তিনি বাছাই করেন তাঁর নিজের সদ্যোজাত মেয়ে এডিথকে। তিনি ঠিক করেন, মেয়ের সাথে তিনি কোন শিশুসুলভ ব্যবহার করবেন না। যত জটিল তথ্যই হোক তিনি মেয়ের সাথে তা শেয়ার করবেন। তিনি এডিথের জন্মের পর থেকেই তার রুমে ক্লাসিকাল মিউজিক বাজাতেন। প্রতিদিন একটা নতুন শব্দ ছবির মাধ্যমে শেখাতেন। এডিথ বুঝতে পারছে কি না তা না জেনেই। মাত্র তিন মাস বয়সেই এডিথ শব্দ আর ছবিগুলো শনাক্ত করতে পারল। এক বছর বয়সেই সে পুরো বাক্যগঠন করে কথা বলতে শিখল। ৫ বছর বয়সে তার এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা পড়া শেষ হয়। ৬ বছর বয়সে

এডিথ দিনে ৬টা করে বই পড়ত আর সকালে পড়ত নিউ ইয়র্ক টাইমস! ১২ বছর বয়সেই সে কলেজে ভর্তি হয় এবং মাত্র ১৫ বছর বয়সে মিশিগান ইউনিভার্সিটিতে নিযুক্ত হয়েছিল উচ্চতর গণিতের শিক্ষক। এটাই তখনকার (১৯৬৭ সালে) সর্বকনিষ্ঠ ভার্সিটি শিক্ষক হবার রেকর্ড।

তবে, আপনার বয়স বেশি হলেও চিন্তার কিছু নেই। আপনার ব্রেনের ক্ষমতা আপনি বাড়াতে পারবেন যে কোন বয়সেই। এখন তা হলে আপনাকে একটা প্রশ্ন করি। যখন কোন কিছু পড়ে আপনার বুঝতে সমস্যা হয় তখন আপনি কী করেন?

আপনার উত্তর যদি হয়, আমি না বোঝা পর্যন্ত বারবার চেষ্টা করি তা হলে ঠিক আছে। কিন্তু, যদি চেষ্টা না করেই হাল ছেড়ে দেন তা হলে খুবই খারাপ ব্যাপার। কারণ, আমার নিজেরই এ ব্যাপারে অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। আমি আগে যখন পড়তাম তখন যে চ্যাপ্টার আমার একটু কঠিন লাগত, তা এড়িয়ে যেতাম। যেগুলো পড়তে ভাল লাগত সেগুলো বারবার পড়তাম। ফলে দেখা গেল, প্রতি পরীক্ষাতেই দু'একটা প্রশ্ন আমাকে ছেড়ে আসতে হচ্ছে। ফলে, রেজাল্ট খারাপ হতে লাগল। বেশ কিছুদিন আমি ডিপ্রেশনে ভুগি। তারপর, 'সঠিক নিয়মে লেখাপড়া' বইয়ের একটা কথা টনিকের মত কাজ করে। তা হলো, আপনি নতুন ক্লাসে যা পড়বেন তা যদি সবই বুঝে ফেলেন মাত্র একবারেই, তা হলে তা পড়ার কী দরকার। আপনাকে নতুন তথ্য জানতে হলে প্রথমেই কনফিউযড্ হতে হবে। কারণ, এটা নির্ধারণ করে যে, নতুন তথ্যটা আপনার ব্রেনের বর্তমান ক্ষমতার ঊর্ধ্বে। এটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখুন। এটাকে বোঝার জন্য আপনাকে এখন পরিশ্রম করতে হবে। ক্লাসে লেকচার শুনবেন। পাঠ্যবই পড়বেন। পত্রিকা, লাইব্রেরী, বন্ধুবান্ধব, শিক্ষক যার কাছ থেকে এ সম্বন্ধে জানতে পারবেন, তাকেই প্রশ্ন করুন। আবার

পাঠ্যবই পড়ুন। এখন দেখবেন, আপনার কাছে বিষয়টা সহজ হয়ে গেছে। মজার ব্যাপার হলো, মানুষের স্বভাবই হলো পালানো। কোন সমস্যা দেখলেই প্রথমে প্রত্যেক মানুষের মাথায় আসে কীভাবে সেটা এড়ানো যায়। একটা উদাহরণ দিই। ক্লাসে হঠাৎ আপনাকে একটা প্রশ্ন করা হলো। আপনি দাঁড়িয়ে যে উত্তর দেবেন তার শতকরা ৯০ ভাগ সম্ভাবনা হলো, উত্তরটা হবে, জানি না। এটা খুবই খারাপ। কারণ, আপনি আপনার ব্রেনকে কোন সুযোগই দিলেন না। আপনি যদি উত্তর নাও জানেন, তবু বলতে পারেন, চেষ্টা করে দেখি বা স্যারকে প্রশ্নটা আবার জিজ্ঞেস করুন।

এতে আপনার ব্রেন চিন্তা করবার সুযোগ পায়। দ্বিতীয়বার, প্রশ্নটা শোনার পর হয়তো আপনি দেখবেন, খুবই সোজা প্রশ্ন। আপনি অমনোযোগী থাকায় ধরতে পারেননি। তাই, জানি না-কে পরিহার করুন। তবে, ইন্টারভিউ বোর্ডে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন, যার উত্তর আপনি কস্মিনকালেও শোনেননি, এমন প্রশ্নের উত্তরে জানি না বলতে পারেন।

তা হলে চলুন জেনে নেয়া যাক ব্রেনকে শক্তিশালী ও কর্মক্ষম করার ৬টি পদ্ধতি:

১. নিয়মিত মিউজিক শুনুন। মিউজিক আপনার নিউরোনের সক্রিয়তা বাড়ায়। তবে, সারাদিন-রাত হাই ভল্যুমে শুনবেন না। দিনে ১৫-৩০ মিনিট নির্দিষ্ট করে শুনুন।

২. ক্লাসে প্রচুর প্রশ্ন করুন আর উত্তর দেবার চেষ্টা করুন।

৩. প্রতিদিনই নতুন নতুন বিষয়ে কিছুটা হলেও পড়ুন।

৪. পাঠ্যবইয়ের বাইরে নানা বিষয়ের জ্ঞান রাখুন। পত্রিকা, গল্পের

বই বা কারেন্ট এফেয়ার্স পড়ুন।

৫. কখনোই কঠিন চ্যাপ্টার এড়িয়ে যাবেন না। কঠিন চ্যাপ্টারগুলোকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখুন।

৬. মনে রাখুন, ভাল জানতে হলে আপনাকে প্রথমে কনফিউযড হতে হবে এবং প্রচুর ভুল করতে হবে। তাই, মূল পরীক্ষার আগে যত ভুল করার করে নিন।

ব্রেনকে নিষ্ক্রিয় করার ৬টি পদ্ধতি

১. কঠিন বিষয়গুলো কখনোই পড়বেন না।
২. কোন বিষয় না বুঝলেও ক্লাসে কোন প্রশ্ন করবেন না।
৩. আপনাকে যাই জিজ্ঞেস করা হোক, উত্তরে বলবেন জানি না।
৪. সোজা জিনিসগুলো বার বার পড়ুন।
৫. পরীক্ষায় বন্ধুদের খাতা দেখে লিখুন।
৬. কখনোই পড়ালেখা সম্বন্ধে আলোচনা করবেন না।

তাই, এখন আপনাকেই বেছে নিতে হবে কী করবেন। আমাদের ব্রেনের মূল অংশ হলো সেরিব্রাম। একে ডান ও বাম এ দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যা কর্পাস ক্যালোসাম নামের একটা অংশ দ্বারা পরস্পরের সাথে যুক্ত। আমাদের ব্রেনের এই দু'দিক ভিন্নধর্মী কাজ করে। যেমন–আপনার ব্রেনের বাম অংশ যুক্তি, অংক, জাগতিক চিন্তা, ভাষা, তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ইত্যাদি নিয়ে কাজ করে। অন্যদিকে ব্রেনের ডান অংশ মজার জিনিসগুলো যেমন–দিবাস্বপ্ন, সুর, কল্পনা, রং, অনুভব ইত্যাদি নিয়ে কাজ করে। এখন দেখা যায় যে, আমাদের স্কুল, কলেজ বা ভার্সিটিতে যা কিছু পড়ানো হয় তার ৯০ শতাংশ ব্রেনের

বাম দিকের সাথে সম্পর্কিত। বাংলা থেকে শুরু করে অংক, হিসাব বিজ্ঞান, ইতিহাস এর সবকটাতেই প্রয়োজন তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, মনে রাখা, অংক করা আর যুক্তিবিদ্যা। ফলে, আপনার বিদ্যালয়ের ৯০ ভাগ সময় বাম ব্রেনের কাজ থাকে। এদিকে আপনার ডান ব্রেন পড়ে থাকে অকেজো। সে কোন কাজ হাতে না পেয়ে আপনার মনোযোগকে নষ্ট করে। তাই, অনেক মনোযোগ নিয়ে ক্লাস শুরু করার পর ক্লাস শেষে দেখবেন আপনার খাতায় শুধুমাত্র কিছু ফুল, পাখি, মানুষের ছবি আঁকা। এতে আপনার কোন দোষ নেই। আপনার ব্রেনের ডান দিক আপনার মনোযোগ চায়। তা হলে, একটু ভেবে দেখুন, আপনার ব্রেনের দুই অংশকে যদি একসাথে কাজে লাগানো যায় তা হলে কেমন হয়?

তা হলে কেমন হয়! শুনুন তিনজন জিনিয়াসের কথা। পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিয়াস আখ্যা পেয়েছেন লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি। তিনি একাধারে বিজ্ঞানী, গণিতবিদ, আর্কিটেক্ট ও চিত্রশিল্পী ছিলেন। তাঁর মোনালিসা ছবির জন্যই তিনি আজীবন অমর থাকবেন। আপনি কি জানেন, একটা ছবি আঁকার আগে তিনি কী করতেন?

তিনি তাঁর নোট বইয়ে প্রথমে অংক করতেন। তাঁর ক্যানভাসে কী কী রং কী কী অনুপাতে মেশানো হবে সব অংক করে বের করতেন। তারপর ব্যবহার করতেন জ্যামিতি। ছবির কোন্ অংশ কীভাবে আঁকবেন সবকিছু জ্যামিতির সূত্র ব্যবহার করে বের করতেন। এরপর, অর্থাৎ ব্রেনের বাম অংশের কাজ সম্পূর্ণ করে তিনি ব্রেনের ডান অংশের কাজ অর্থাৎ ছবি আঁকা শুরু করতেন। তাই, তাঁর ছবি নিখুঁত আর অতুলনীয়।

এবার আসি আইনস্টাইনের কথায়। বাজে ছাত্র বলে তাঁকে স্কুল থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল। কারণ, তিনি তখন শুধু ব্রেনের ডান দিক ব্যবহার করতেন। যার ফলে, অল্প বয়সেই ভাল

ভায়োলিন বাদক হিসেবে নাম করেন। যখন ব্রেনের বাম অংশকে কাজে লাগানো শুরু করেন, তখনই বিজ্ঞানী হিসেবে পরিচিতি পান। তাঁর শখ ছিল দিবাস্বপ্ন দেখা। এমনই একদিন তিনি স্বপ্ন দেখেন, সূর্য থেকে এক আলোকরশ্মিতে চড়ে মহাকাশ ভ্রমণ করে তিনি আবার সূর্যে ফিরে এসেছেন। এ স্বপ্নই তাঁকে ভাবতে উদ্ধুদ্ধ করে যে, যদি আলোকরশ্মি বাঁকানো পথে চলে তা হলেই কেবলমাত্র একই বিন্দুতে যাত্রা শুরু আর শেষ করা সম্ভব। আলোর কক্ষপথে যদি বিচ্যুতি ঘটে তা হলে স্থান বা সময়েরও বিচ্যুতি ঘটা সম্ভব। তাঁর এ স্বপ্ন প্রমাণ করার জন্য দিনরাত অংক করেন। আর কয়েক বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে প্রমাণ করেন, থিওরী অভ রিলেটিভিটি।

এবার, তা হলে বলি, আমাদের গর্ব ড. মুহম্মদ ইউনুসের কথা। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ গড়বেন। এ স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য তিনি কাজ শুরু করেন। এরপর ডান ব্রেনের আইডিয়ায় জন্ম দেন Microcredit বা ক্ষুদ্রঋণের। আর বাম ব্রেনের সাহায্যে তাঁর বাস্তবায়ন করেন বাংলাদেশের গ্রাম থেকে গ্রামে। বাংলাদেশ যদিও দারিদ্রমুক্ত হয়নি, তবুও ড. ইউনুসের এই আইডিয়া বাংলাদেশের জন্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সর্বোচ্চ সম্মান 'নোবেল প্রাইজ' এনে দিয়েছে।

তাই, আপনিও যদি ব্রেনের দু'অংশকে কাজে লাগাতে পারেন, দেশ একদিন আপনাকে নিয়েও গর্ব করবে। তা হলে আসুন জেনে নিই, আপনি ব্রেনের কোন্ অংশ বেশি ব্যবহার করেন।

পৃথিবীর সর্বত্রই ছাত্ররা দু'ভাগে বিভক্ত। তাঁদের অধিকাংশই ব্রেনের ডান দিক বেশি ব্যবহার করেন। আর স্বল্প সংখ্যক ছাত্রের রয়েছে বাম দিকের প্রাধান্য। যাঁরা বাম দিক বেশি ব্যবহার করেন

তাঁদের বৈশিষ্ট্য–

১. তাঁরা খুবই গোছানো স্বভাবের। তাঁদের চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো, শার্টপ্যান্ট বা জামা ইস্ত্রি করা।

২. তাঁদের পেন্সিলবক্স থাকে, আর তাতে সর্বদাই প্রয়োজনীয় পেন্সিল, কলম, রাবার সাজানো থাকে।

৩. তাঁদের বাসার টেবিল থাকে ঝকঝকে। বইপত্র গোছানো। এমনকী কোন বন্ধুও যদি তাঁদের জিনিসপত্রে হাত দেয় তাঁরা খুবই বিরক্ত হন এবং টেনশন করেন যে, ঠিকঠাক রাখবেন কিনা।

৪. তাঁরা পাযল গেম, IQ টেস্টে বেশ ভাল। তাঁরা বাবা মায়ের আদর্শ সন্তান।

৫. তাঁদের মূল সমস্যা তাঁরা অসামাজিক। তাঁদের বন্ধু খুবই অল্প। সামাজিক যে কোন অনুষ্ঠানেই তাঁরা বিব্রত বোধ করেন। নতুন লোকজনের সাথে মেশা বা নতুন কিছু সৃষ্টি করতে তাঁরা অপারগ।

ডান দিকপ্রধান ছাত্ররা এর বিপরীত। তাঁদের বৈশিষ্ট্য—

১. তাঁদের চুল, জামাকাপড় সব এলোমেলো।

২. ক্লাসে তাঁদের প্রধান কাজ দুষ্টামী করা নয়তো দিবাস্বপ্ন দেখা।

৩. তাঁদের ঘরদোর অগোছালো। তাঁদের বইপত্র, কলম নানা জায়গায় ছড়ানো অবস্থায় থাকে।

৪. তাঁদের থাকে প্রবল অংক ভীতি।

৫. তাঁরা খেলাধূলা, ছবি আঁকা, গানবাজনায় বেশ ভাল। লোকজনের সাথে মেলামেশা আর নতুন বন্ধু তৈরিতে এঁরা ওস্তাদ।

তা হলে বুঝতে পারছেন, আপনি কোন্ ক্যাটাগরীতে পড়েন। আপনি হয়তো জানতে চাচ্ছেন, কোনটা বেশি ভাল। আমি বলব, দু'টোই জীবনে প্রয়োজন। আপনি ভাল ছাত্র বলে ছবি আঁকতে, গান গাইতে বা বন্ধু বানাতে পারবেন না, এ কেমন কথা! আবার আপনি ভাল ক্রিকেটার বলে পরীক্ষায় A+ পাবেন না, এটাও গ্রহণযোগ্য নয়। আর তাই উন্নত বিশ্বের পড়ালেখার পদ্ধতিতে এসেছে আমূল পরিবর্তন। আপনার ব্রেনের দু'অংশকে কাজে লাগিয়ে আপনি যেমন পড়ালেখাকে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারেন, তেমনি অংক বা ফিজিক্সের জ্ঞানকে কাজে লাগাতে পারেন ক্রিকেট খেলায়।

আগামী তিনটি অধ্যায়ে, উন্নতবিশ্বের এ নতুন শিক্ষাপদ্ধতির আলোচনা করা হয়েছে। আপনি যদি সত্যিই চান পড়ালেখাকে আকর্ষণীয় আর আনন্দময় করতে, তা হলে চলুন আমার সাথে আগামী অধ্যায়ে।

POWER READING FOR INFORMATION

আপনি যে ক্লাসে, যে বিষয়েই পড়ুন না কেন, প্রথমেই আপনাকে পাঠ্যবইগুলো পড়তে হবে। অনেকেই শুধু নোট বই পড়েন। এর ফলাফল মারাত্মক। কারণ, এখন আপনি ভাল নম্বর পেয়ে পাস করলেও কর্মজীবনে পড়বেন নানা সমস্যায়। কারণ, আপনার মাঝে থাকবে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব। সব বিষয়েই ভাসা-ভাসা জ্ঞান থাকায় কর্মজীবনে সাফল্য পাবেন না। এখন, আপনি বলতে পারেন, পাঠ্যবই পড়তে প্রচুর সময় লাগে। আর এত পড়া পরীক্ষার আগে রিভিশন দেওয়া সম্ভব না। এ বিষয়ে আপনার সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত। তাই, আপনাকে এখন জানাতে চাই কীভাবে আপনি আপনার পড়ার সময় ৮০ ভাগ কমিয়ে ফেলবেন আর মনে রাখতে পারবেন আগের চেয়ে ৪ গুণ বেশি তথ্য!

এ জন্য আপনাকে প্রথমেই জানতে হবে যে, পাঠ্যবইয়ে অপ্রয়োজনীয় শব্দের সংখ্যাই বেশি এবং তা শতকরা ৮০ ভাগ জায়গা দখল করে থাকে। প্রয়োজনীয় শব্দ দখল করে ২০ ভাগ জায়গা। তাই সেই ২০ ভাগ তথ্য যদি আপনি মনে রাখতে পারেন তা হলে বাকি ৮০ ভাগ পড়ার কোন দরকার নেই। এ ৮০ ভাগ শব্দের কাজ হলো, আপনাকে যে তথ্যগুলো জানানো প্রয়োজন তাদের মাঝে সংযোগ সাধন করা। আপনি যখন

প্রথমবার কোনকিছু পড়েন তখন এ শব্দগুলো আপনাকে কোন তথ্য বুঝতে সাহায্য করে। কিন্তু, দ্বিতীয়বার বা রিভিশনের সময় এগুলো হলো শুধুই জঞ্জাল। তাই, বাকি ২০ ভাগ শব্দ, যা আপনাকে প্রয়োজনীয় সব তথ্য দিচ্ছে তাদের আমরা নাম দিতে পারি Key word. এটা অনেকটা জাল দিয়ে মাছ ধরার মত। এক্ষেত্রে পুকুরের পানি আপনার খাবার কাজে লাগছে না। আপনার লক্ষ্য মাছ খাওয়া। এখন, Power Reading বা জালের মাধ্যমে আপনি মাছ, মানে তথ্য তুলে আনলেন। তারপর, মাছ নিশ্চয়ই আপনি কাঁচা খাবেন না। তাতে মশলা মিশিয়ে রান্না করবেন। এ ধাপটার নাম Mind Mapping. ® একটা চ্যাপ্টারকে নদী বা পুকুর ধরা হলে তার মাছগুলো তুলে সাজিয়ে ফেললে আপনাকে বারবার জাল ফেলতে হবে না। আমি জানি, আপনি এখনও আমার কথাগুলো ঠিকমত বুঝতে পারেননি। তা হলে, নীচের প্যাসেজটা পড়ুন–

'বেশ কিছুদিন যাবৎ বিজ্ঞানীদের গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে যে, মানুষের ব্রেনকে দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়। আর, তা হলো বাম ব্রেন আর ডান ব্রেন। এ গবেষণায় আরও জানা যায়, ব্রেনের ডান অংশ নিয়ন্ত্রণ করে শরীরের বাম দিক আর বাম অংশ নিয়ন্ত্রণ করে শরীরের ডান দিক। এটা জানার জন্য বিজ্ঞানীরা অনেক পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। আর, এর ফলে তাঁরা দেখতে পান, যদি ব্রেনের ডান দিক নষ্ট হয়, তা হলে শরীরের বাম দিক অকেজো হবে, আর ব্রেনের বাম দিক নষ্ট হলে শরীরের ডানদিক অকেজো হয়ে পড়ে। তা হলে, এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, ব্রেনের যেদিক নষ্ট হবে, শরীরে তার উল্টোদিক নিঃসাড় হয়ে যাবে।'

এই প্যাসেজটা পড়ে আপনি নির্দিষ্ট সংখ্যক তথ্য পাচ্ছেন।

এবার, নীচের প্যাসেজটা পড়ুন।

'মানুষের ব্রেনের দু'টি ভাগ–ডান আর বাম। ডান ব্রেন নিয়ন্ত্রণ করে শরীরের বাম অংশ। বাম ব্রেন শরীরের ডান অংশ। ব্রেনের ডান দিক নষ্ট, শরীরের বামদিক অকেজো। ব্রেনের বামদিক নষ্ট শরীরের ডানদিক অকেজো। ব্রেনের যে অংশ নষ্ট, শরীরের বিপরীত দিক নিঃসাড়।'

দেখুন, এ কয়টি শব্দ পড়লেই কি সবগুলো তথ্য পড়া হয়ে যাচ্ছে না? এ শব্দগুলোই Key word. এবার, বাকি শব্দগুলো পড়ে দেখুন–

'বেশ কিছুদিন যাবৎ বিজ্ঞানীদের গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে। ভাগ করা যায়। /ব্রেন/ব্রেন/এ গবেষণায় আরও জানা যায়/করে/নিয়ন্ত্রণ করে/এটা জানার জন্য বিজ্ঞানীরা অনেক পরীক্ষানিরীক্ষা করেন/আর তাঁরা এর ফলে দেখতে পান যে/যদি হয়/হয়।/ব্রেনের/হলে/ হয়ে পড়ে/ তা হলে এ সিদ্ধান্তে আসা যায়/হবে/তার/হবে।

দেখুন, এই এতগুলো শব্দ থেকে আপনি কী জানতে পারছেন? এ শব্দগুলো আপনাকে প্রথমবার পড়তে সাহায্য করে। এরপর এদের কোন প্রয়োজন নেই। যে কোন পাঠ্যবইয়ের ৮০ ভাগ অংশ এরা দখল করে রাখে। আপনার কাজ হলো, বাকি ২০ ভাগ অংশকে আলাদা করে ফেলা এবং তাদের সাজিয়ে নোট বানানো। তার বর্ণনা আছে Mind Map ® অধ্যায়ে। Key word কোন প্যাসেজের সারাংশ বা সারমর্ম নয়। কারণ, সারাংশে মূলভাবকে লেখা হয়। এতে অনেক তথ্য বাদ পড়ে যায়। Power Reading-এ কোন তথ্যই বাদ পড়ে না। Power Reading-এর আরেকটি অংশ হলো দ্রুত পড়া।

এটা এমন এক পদ্ধতি যাতে আপনার পড়া শুধু দ্রুত হবে

তাই নয়, সেই সাথে বাড়বে আপনার মনোযোগ আর বিশ্লেষণক্ষমতা। আপনি যদি অমনোযোগিতা আর বুঝতে না পারার সমস্যায় ভোগেন তা হলে জেনে রাখুন, এর মূল কারণ হলো ধীরে পড়া। আপনি আপনার ক্ষমতার চেয়ে অনেক ধীরে পড়েন। একটু চেষ্টা করলেই আপনি আপনার পড়ার গতি বাড়াতে পারবেন প্রায় তিনগুণ। তা হলে, আপনি অনেক সময় পাবেন আড্ডা দেবার বা নোট বানাবার।

অনেকেই ভাবেন, ধীরে ধীরে না পড়লে মনোযোগ আসে না। আর ঠিকমত বোঝাও যায় না। কিন্তু, সত্য হলো এই যে, এটাই তাদের অমনোযোগিতা আর না বোঝার প্রধান কারণ। পড়ার গতি যতই বাড়াবেন, আপনার মনোযোগ তত বাড়বে। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে, একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ মিনিটে ২০,০০০ শব্দ পড়তে সক্ষম। কিন্তু, বেশিরভাগ মানুষই পড়েন মিনিটে ১০০-২০০ শব্দ। তারমানে, আপনি আপনার ক্ষমতার মাত্র ১% ব্যবহার করছেন। একটা উদাহরণ দিই। ধরুন, কোন কোম্পানিতে ১০০ জন শ্রমিক আছে। কিন্তু কাজ আছে মাত্র ১ জনের। তা হলে, বাকি ৯৯ জন কী করবে? তারা প্রথমে আড্ডা দেবে, তারপর ইউনিয়ন বানাবে, একসময় কোম্পানী বন্ধ করে দেবে। ধীরে ধীরে পড়লে ঠিক এ সমস্যাটাই হয়। আপনার ১৯৯ মিলিয়ন নিউরন কাজ খুঁজে পায় না। তাই, তারা অন্য চিন্তার দিকে ধাবিত হয়। ফলে আপনার মনোযোগ থাকে না।

আমি আগে মিনিটে ১০০-১৫০টি শব্দ পড়তাম। মাত্র তিনমাস চেষ্টা করে মিনিটে ৭০০-৮০০ শব্দ পড়তে পারছি। আমি জানি যে, আপনি চেষ্টা করলে অবশ্যই আমার চেয়ে বেশি শব্দ পড়তে পারবেন। এই দ্রুত পড়বার সুবিধা কী, সেটার আরেকটা উদাহরণ দিই।

মনে করুন, আপনাকে একটা ঝকঝকে নতুন BMW গাড়ি চালাতে দেওয়া হলো। গাড়িটা সর্বোচ্চ ২৫০ কিমি স্পীড তুলতে পারে। এখন যদি ঢাকা-চট্টগ্রাম হাইওয়েতে ফাঁকা রাস্তায় আপনি মাত্র ২৫ কিমি বেগে চালান তা হলে আপনার মনোযোগ কেমন থাকবে? এবার, চিন্তা করুন, আপনি এক্সেলারেটররে চাপ দিয়ে স্পীড ২০০ কিমিতে তুলে ফেলেছেন। এবার অনুভব করুন আপনার কী কী পরিবর্তন হচ্ছে। আপনি খুবই সজীব ও সতেজ হয়ে উঠেছেন, আপনার চোখ প্রশস্ত, আপনি গভীরভাবে শ্বাস নিচ্ছেন। আপনার সবগুলো ইন্দ্রিয় যে কোন অবস্থার জন্য প্রস্তুত। এখন, অন্য কোনদিকেই আপনার মনোযোগ চলে যাওয়ার চান্স নেই। আপনি যখন খুবই দ্রুতগতিতে পড়বেন ঠিক এ ঘটনাটিই ঘটে। আপনি সজীব ও সজাগ অবস্থায় থাকবেন। আপনার বোঝার ক্ষমতাও বেড়ে যাবে বহুগুণ।

এখন, নিশ্চয়ই আপনার জানতে ইচ্ছে করছে, এটা কীভাবে সম্ভব? বলছি। তার আগে আপনি বলুন তো আপনার চোখ কীভাবে পড়ে? আপনার উত্তর হয়তো হবে, বাম থেকে ডানে বা ডান থেকে বামে এক লাইন বরাবর পড়ে। আসলে ঘটনা তা নয়। আমাদের চোখ কম্পিউটারের কি বোর্ডের বর্ণমালার বিন্যাসের মত পৃষ্ঠার উপর এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ায়। যখন কোন কিছু মনোযোগ দিয়ে পড়েন তখন এটা শব্দের ওপর থেমে থেমে পড়ে। যতবার থামছেন ততবার $1/4$ সেকেন্ড নষ্ট হচ্ছে। সাধারণ মানের পাঠক বা ছাত্ররা একটা একটা করে শব্দ পড়েন, ফলে, প্রতিটা শব্দ পড়তে যাদি $1/2$ সেকেন্ড সময় লাগে তা হলে মিনিটে ১২০টা শব্দ পড়া হয়। এটা গড়পড়তার চেয়েও কম। Power Reading-এর মূল লক্ষ্য হলো আপনার চোখের পলক ফেলবার আগেই একসাথে অনেকগুলো করে শব্দ পড়ে ফেলা। আপনি যদি একসাথে ২-৩টি শব্দ পড়েন তা হলে স্পীড হবে ২০০-৩৬০ মিনিট। এটা মাঝামাঝি স্পীড। এক সপ্তাহ চেষ্টা

করলেই আপনি এ স্পীডে পড়তে পারবেন। কিন্তু, আপনার লক্ষ্য হবে একসাথে ৫-৭ টি শব্দ পড়া। তা হলে ৬০০-৮৪০টি শব্দ আপনি পড়তে পারবেন প্রতিমিনিটে। তা হলে, এখন একটা স্টপওয়াচ নিন। এ বইয়ের যে কোন অধ্যায় পড়ে ফেলুন। একমিনিটে কতগুলো শব্দ পড়লেন তা গুনে দেখে নিন আপনার বর্তমান স্পীড। এখন যদি আপনার স্পীড অনেক কম হয় তা হলে জেনে নিন এর পেছনের কারণগুলো–

(১) শব্দ করে পড়া

অনেকেই ছোটবেলার এ অভ্যাস ছাড়তে পারেন না। আপনার গলার গতি কখনও চোখের ধারে কাছে নয়। আপনি যেখানে ১ সেকেন্ডে দেখতে পারছেন ২০ টি শব্দ, সেখানে পড়ছেন ১ টি শব্দ। ফলে, যেটা মুখে উচ্চারণ করবেন, সেটা দেখে চোখ পরবর্তী কয়েকটা শব্দ ঘুরে দ্বিতীয় শব্দে আসে। ফলে, মনোযোগ হয় পথভ্রষ্ট। আপনি যদি কবিতা আবৃত্তি করেন বা নাটকে অভিনয় করেন, তা হলে এ পদ্ধতিতে সংলাপ মুখস্থ করতে পারেন। কিন্তু, পড়ালেখার জন্য এটা কোন পদ্ধতি নয়। অবশ্য বাচ্চা ছেলেমেয়েরা এভাবে পড়তে পারে। তাদের জন্য এ পদ্ধতি ভাল। কিন্তু, এ পদ্ধতি আপনার পড়ার গতিকে খুবই কমিয়ে দেয়।

(২) ঠোঁট নাড়ানো

আপনার কি পড়ার সময় ঠোঁট নড়ে? এটাও আপনার গতি কমিয়ে দেয়।

(৩) মনে মনে পড়া

অনেকেই ঠোঁট কিংবা জিভ নাড়ান না, তবে পড়ার সময় তাঁদের মনে মনে আরেকজন পাঠ করে। এই ভেতরের কণ্ঠস্বর আপনাকে অনেক ধীর করে ফেলে, আপনার সময় নষ্ট করে।

(৪) বারবার পড়া

এটা সবচে কমন সমস্যা। অনেকেই দু'লাইন পড়ে আবার প্রথম থেকে শুরু করেন। তাঁদের পড়ার গতি মিনিটে ৫০-১০০। এর মূল কারণ হলো আত্মবিশ্বাসের অভাব। নিজের উপর বিশ্বাস রাখুন। আপনার এ স্বভাব ঝরে যাবে অচিরেই।

(৫) শব্দ ধরে পড়া

আগেই বলেছি, প্রতিটা শব্দ আলাদা আলাদা করে পড়লে মিনিটে ১২০টার বেশি শব্দ পড়া সম্ভব নয়।

(৬) কম শব্দ দেখা

আমাদের প্রত্যেকেরই ক্ষমতা আছে একসাথে ৫-৭টা শব্দ দেখার। কিন্তু, আমরা তা করি না। বেশি শব্দ না দেখলে আপনার পড়ার গতি বাড়বে না।

এবার তা হলে পড়ার স্পীড বাড়ানোর কিছু অনুশীলন দেওয়া হলো–

(১) একটা কলম, পেন্সিল বা মার্কারকে পেসার (Pacer) হিসেবে নিন

আপনি দেখবেন, বই পড়তে গেলে আপনার চোখ মাঝে মাঝে দু'তিন লাইন নীচের কিছু শব্দ দেখে আবার পড়ার লাইনে চলে আসে। তাই, চোখের এই ইতস্তত ভ্রমণ বন্ধ করতে হাতে কলম নিন। এটা আপনার লক্ষ আর মনোযোগ বৃদ্ধি করবে। এ কলমকে লাইনের উপর আপনার বর্তমান গতির চেয়ে অনেক দ্রুতগতিতে সরাবেন। এখনই একটা কলম নিয়ে এ প্যারাটা আবার পড়ুন। দেখুন, আপনার গতি আর মনোযোগ কতখানি বেড়ে গেছে।

(২) Key Word বের করা

প্রথমেই মাথায় রাখুন যে, প্রতিটা প্যারা একটা Key Idea নির্দেশ করে আর তার ব্যাখ্যা করে কিছু Key word. প্রথমবার পড়বার সময় Key word-গুলোকে খুঁজুন। দ্বিতীয়বার পড়ার সময় সেগুলো দাগ দিয়ে আলাদা করে ফেলুন। এই আইডিয়া নিয়ে পড়লে আপনার মনোযোগ অনেক বেড়ে যাবে।

(৩) একসাথে ৫-৭টা শব্দ পড়ার চেষ্টা করুন

নীচে দুটি কলাম আছে। প্রথমে বাম দিকেরটা পড়ুন। আপনার চোখকে মাঝখানের শব্দের উপর রাখুন। এবার চোখ না নাড়িয়েই প্রথমে বামে, পরে ডানের শব্দটা পড়ুন। এবার কলামের মাঝ বরাবর নীচের দিকে নামুন এবং চোখ মাঝ বরাবর রেখেই প্রথমে বাম, পরে ডানের শব্দ পড়ুন। এবার, ডান দিকের কলামে যান। আপনার কলম মাঝখানের শব্দের নীচে রাখুন এবং একই ভাবে বাম ও ডানের শব্দ পড়ে নীচের লাইনে যান। খেয়াল রাখবেন যেন আপনার চোখ প্যারার মাঝ বরাবর নীচে নামে।

A	B	C	এখন	আপনি	জানেন
N	V	D	কীভাবে	পড়তে	হবে
K	B	L	তাই	আপনি	আগের
N	E	K	চেয়ে	দ্রুত	পড়তে
P	Q	R	পারছেন।	আরও	দ্রুত
S	Z	M	পড়তে	শিখবেন	শীঘ্রই।

এবার ডানদিকের কলামের মাঝ বরাবর যে দাগ টানা আছে তা ধরে প্রথমে বামে পড়ে, তারপর ডানে পড়ে নীচের লাইনে যান।

ক	খ	গ	অনেকেই ভাবেন ধীরে ধীরে
চ	জ	প	না পড়লে মনোযোগ আসে না।
ব	ভ	ম	আর ঠিকমত বোঝাও যায় না।
র	চ	ছ	কিন্তু, সত্য হলো এই যে
ল	ন	ঝ	এটাই তাঁদের না বোঝার
অ	ক	ত	প্রধান কারণ। পড়ার গতি
দ	ন	ধ	যতই বাড়াবেন, আপনার মনোযোগ
স	শ	হ	ততই বাড়বে। বিজ্ঞানীরা গবেষণা
র	ব	গ	করে দেখিয়েছেন যে, একজন
ঙ	থ	দ	পূর্ণ বয়স্ক মানুষ মিনিটে ২০,০০০
ক	খ	গ	শব্দ পড়তে সক্ষম, কিন্তু বেশিরভাগ
চ	গ	প	মানুষই পড়েন ১০০-২০০ শব্দ। তার মানে,
ব	ঙ	ম	আপনি আপনার ক্ষমতার মাত্র ১%
ল	গ	ঝ	ব্যবহার করছেন। একটা উদাহরণ দিই।
প	ফ	ব	ধরুন, কোন কোম্পানীতে ১০০ জন শ্রমিক
ভ	ম	য	আছে। কিন্তু, কাজ আছে মাত্র ১জনের।
র	ল	স	তা হলে, বাকি ৯৯ জন কী করবে?
শ	হ	ত	তারা প্রথমে আড্ডা দেবে তারপর
থ	দ	ধ	ইউনিয়ন বানাবে, একসময় কোম্পানী
ঙ	ঝ	ফ	বন্ধ করে দেবে। ধীরে পড়লে এসমস্যাই হয়।

এখন, প্রায় সব বইয়েই দু'টি কলামে লেখা হয়। এটা করা হয়েছে দ্রুত পড়ার জন্যই। এভাবে পড়তে পারলে আপনার পড়ার গতি অনেক, অনেক বেড়ে যাবে।

(৪) দ্রুতগতির গান বা মিউজিক শোনা অভ্যাস করুন

পড়ার আধঘণ্টা আগে দ্রুতগতির গান বা মিউজিক শুনুন। একেবারে শব্দহীন পরিবেশে পড়া ভাল হয়, এটা ঠিক না। কারণ

দেখবেন, আপনার ভেতর তখন আরেকজন মনে মনে কথা বলতে থাকে। সেটা যদি এড়াতে চান তা হলে দ্রুতলয়ে মিউজিক খুবই কম ভলিউমে লাগিয়ে পড়তে পারেন। এতে পড়ার সমস্যা হলে মিউজিক বন্ধ রেখেই পড়ুন।

(৫) প্রত্যেক চ্যাপ্টার পেছন থেকে পড়া অভ্যাস করুন

অনেক ছাত্রই কোন চ্যাপ্টার পড়বার আগে প্রশ্ন দেখতে চান না। বেশিরভাগ পাঠ্যবইয়ের অধ্যায়ের শেষে সে অধ্যায়ের প্রশ্ন দেওয়া থাকে। যদি প্রশ্ন না থাকে তা হলে নোট বই বা টেস্ট পেপার অথবা বিগত বছরের প্রশ্ন যোগাড় করুন। চ্যাপ্টারের নামটা দেখে প্রথমেই এর প্রশ্নগুলো দেখে নিন। তা হলে, আপনার ব্রেন বুঝতে পারবে কোন্ অংশগুলো গুরুত্বপূর্ণ। সবচেয়ে ভাল হয়, প্রথমে একটা সাদা কাগজে একটা চ্যাপ্টারের সম্ভাব্য প্রশ্নগুলো লিখে ফেললে। তারপর, পড়া শুরু করুন। লক্ষ রাখুন, সবকটা প্রশ্নের উত্তর আপনার জানা হচ্ছে কিনা। এতে কী লাভ হবে তা আপনি এখন একটা চ্যাপ্টার পড়েই দেখুন। আপনার মনোযোগ, আর বোঝার ক্ষমতা দু'টোই অনেক বেড়ে যাবে। একটা প্যারা আপনি যতটা অবহেলায় পড়তেন, প্রশ্ন জানা থাকায় আপনি সে প্যারাটাই পড়বেন অনেক মনোযোগ দিয়ে। ফলে, আপনার পড়ার মান ও মনে রাখার ক্ষমতাও বাড়বে।

(৬) নিজের উপর বল প্রয়োগ করুন

আপনি কি জানেন, দৌড়বিদরা কীভাবে ট্রেনিং করেন? ট্রেনিং সেশনে তাঁদের পায়ে ভারী ওজন বেঁধে দেওয়া হয়। এতে তাঁরা যতই অস্বস্তি বোধ করুন না কেন, তাঁদের মাংসপেশী অনেক সবল হয়। ফলে, যখন ওজন খুলে দৌড়াতে বলা হয়, তাঁদের স্পীড তখন বেড়ে যায় বহুগুণ। আপনাকেও এ অভ্যাস করতে হবে। Power Reading-এ প্রত্যেকবার আগের চেয়ে দ্রুত পড়ার উপর চাপ দিন। প্রথমে খুব অস্বস্তি হবে। মনে হবে, কিছুই

বুঝতে পারছেন না। আমার নিজেরও এ সমস্যা হচ্ছিল। প্রথম দু'সপ্তাহ কী পড়ছি না পড়ছি কিছু বুঝিনি। তবুও আমি স্পীড বাড়িয়ে গেছি। একসময় দেখলাম, সবকিছু বুঝতে পারছি। মোটামুটি, একমাস সময় লাগে এতে অভ্যস্ত হতে। তারপর, আপনি নিজেই অবাক হয়ে যাবেন। কারণ, এটা অদ্ভুত আনন্দের সৃষ্টি করে। আপনি যখন মিনিটে ৭০০-৮০০ শব্দ পড়ে ফেলবেন, আর তা মনেও রাখতে পারবেন, তখন আপনার খুবই আনন্দ হবে। তবে, অবশ্যই এটা প্র্যাকটিসের ব্যাপার। আমার ১ মাস লাগলেও আপনি হয়তো আরও দ্রুত পারবেন। এ অধ্যায়ের অনুশীলনগুলো করে চলে আসুন সুপার মেমোরীতে।

(৭) কল্পনাশক্তির যথাযথ ব্যবহার করুন

আমাদের ব্রেনকে যথাযথ স্টিমুলেশন দেওয়া হলে তা কল্পনা ও বাস্তবের মাঝে পার্থক্য বুঝতে পারে না। আমরা যখন কল্পনা করি তখন বাস্তবের মতই নিউরোকানেকশন তৈরি হয়। বিশ্বাস হচ্ছে না! তা হলে এখনই একটা পরীক্ষা করে দেখুন। নীচের প্যারাটি পড়ে তা কল্পনা করুন।

আপনার বাসায় একটা ফ্রিজ আছে। ফ্রিজ থেকে একটা কাঁচা লেবু বের করুন। অনুভব করুন লেবুটা কেমন ঠাণ্ডা, দেখুন এর হালকা সবুজ রং। এবার লেবুটা টেবিলে একটা প্লেটের উপর রেখে ধারাল ছুরি দিয়ে কাটুন। দেখুন, কাটার সময় লেবুটা থেকে রস ছিটকে বেরুচ্ছে। আপনার হাতের আঙুল ঠাণ্ডা লেবুর রসে ভিজে গেছে। এবার কাটা টুকরোটা আপনার মুখে ঢুকিয়ে চিবুতে থাকুন। জিভ দিয়ে স্বাদ নিন। কতটা টক!

আপনি যদি ঠিকমত কল্পনা করে থাকেন, তা হলে এতক্ষণে আপনার মুখে লালার পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে। আর লেবু চিবানোর সময় আপনার মুখ কুঁচকে গেছে। কিন্তু দেখুন, বাস্তবে এ লেবুটার কোন অস্তিত্বই নেই।

রাশিয়ার জিমন্যাস্টিক সাফল্য

অনেক বছর ধরে জিমন্যাস্টিকে রাশিয়ার একাধিপত্য ছিল। আমেরিকানরা তাদের সমান কিংবা বেশি পরিশ্রম করেও তাদের চেয়ে ভাল ফলাফল করতে পারছিল না। এরপর, তারা গোয়েন্দা নিয়োগ করে। যার ফলে জানা যায় যে, রাশিয়ানরা জিমন্যাস্টদের জন্য স্পোর্ট সাইকোলজিস্ট নিয়োগ করেন। তাঁরা প্রত্যেক খেলোয়াড়কে প্র্যাকটিসের পাশাপাশি দু'ঘণ্টা করে প্রতিদিন কাল্পনিক প্র্যাকটিস করান। কল্পনায় তাঁরা নিখুঁত ডাইভিং, ব্যালান্স রাখা প্র্যাকটিস করেন। তাঁদের এই কল্পনার অনুশীলনই নিখুঁত ফলাফল লাভে সাহায্য করে।

Voodoo

ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের মানুষরা Voodoo আর ব্ল্যাক ম্যাজিকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে। এক্ষেত্রে দেখা যায়, কোন অন্যায় করলে বা যাদুকরদের বিরুদ্ধে কোন কাজ করলে যাদুকররা এমন অভিশাপ দেন যে, 'আগামী নতুন চাঁদের আগেই তুমি মারা যাবে।' এ অভিশাপ শোনার পর তাদের বিশাল সাইকোলজিক্যাল পরিবর্তন ঘটে। অমাবস্যা যতই এগিয়ে আসতে থাকে, তারা ততই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। ফলে, দেখা যায়, তারা সত্যি সত্যিই মারা যায়। চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, এসব লোকদের কোনও শারীরিক সমস্যা ছিল না। শুধুমাত্র বিশ্বাসের প্রবল শক্তিই তাদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়।

একটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা

এ পরীক্ষাটি করা হয় আমেরিকার একটি ভার্সিটিতে। বাস্কেটবল খেলার পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই এমন ২৪ জন সমবয়সী ছেলেকে বাছাই করা হয়। তাদের সবাইকে ১ সপ্তাহ একসাথে বাস্কেটবল ট্রেনিং দেয়া হয়। এরপর তাদেরকে সমান তিনটি দলে ভাগ করা হয়। প্রথম দল ২য় সপ্তাহে ট্রেনিং করে বাস্কেট বা স্কোর করার।

দ্বিতীয় দল ২য় সপ্তাহে ট্রেনিং করে একজন সাইকিয়াট্রিস্টের অধীনে। তারা দিনে দু'ঘণ্টা করে মানসিক অনুশীলন করে বাস্কেট করার। আর তৃতীয় দলকে খেলা বা মানসিক অনুশীলন কোনটাই করতে দেয়া হয়নি।

দু'সপ্তাহ পর এ তিনটি দলের পারফর্মেন্স দেখা হয়। দেখা গেল, তৃতীয় দলের পারফর্মেন্স আগের চেয়ে খারাপ হয়েছে। আর, প্রথম ও দ্বিতীয় দলের পারফর্মেন্স সমপরিমাণ অর্থাৎ ৫০% ইমপ্রুভ্‌ড হয়েছিল।

বিখ্যাত গলফার টাইগার উড্‌স তাঁর প্রতিটা শট মারার আগে কল্পনা করে নেন কতটা জোরে মারলে বল গর্তে পড়বে। ফলে, তিনি নিখুঁত স্কোর করেন।

তাই, আপনি যদি সঠিকভাবে কল্পনাকে ব্যবহার করতে পারেন তা হলে আপনিও লাভ করবেন এমন সাফল্য। পরবর্তী অধ্যায়ে কল্পনাকেও ব্যবহারের উপায় বলা হয়েছে। আসুন তা জেনে নেই।

Super Memory

আমার দেখা বেশিরভাগ ভাল বা খারাপ ছাত্রের মূল সমস্যা হলো মনে না থাকা। যত ভালভাবেই পড়া হোক না কেন, মনে থাকে না। কেউ একটা তথ্য দু'দিন, কেউ হয়তো দু'মাস মনে রাখতে পারেন। কিন্তু, তারপর ভুলে যান। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রচুর পড়বার পরে পরীক্ষার হলে গিয়ে কিছুই মনে পড়ছে না। হয়তো, এ প্রশ্নটাই আপনি সবচেয়ে ভাল মুখস্থ করেছিলেন, হয়তো, এ অংকটাই আপনি বাসায় তিনবার করে এসেছেন, কিন্তু কোন্ লাইনে

সূত্র বসালে অংকটা মিলবে তা বের করতে পারছেন না। স্মৃতিশক্তির এমন বিড়ম্বনা এত বেশি যে, প্রায় সবাই ভাবেন এটা ঈশ্বরপ্রদত্ত। কিন্তু, ভুল কথা। দেখুন, আপনিই হয়তো আপনার জীবনে ঘটে যাওয়া কোন ঘটনা একেবারে নিখুঁতভাবে মনে রাখতে পারছেন। কিন্তু, আজকে সকালে কী দিয়ে নাস্তা করেছেন, মনে করতে পারছেন না। কোন কিছু মনে থাকার পেছনে অনেকগুলো কারণ কাজ করে যা আমি পরে ব্যাখ্যা করব। তবে, প্রথমে জেনে নিন, মনে রাখা জরুরী কেন? আপনি যে বিষয়ের ছাত্রই হোন না কেন, কিছু তথ্য আপনাকে মনে রাখতেই হবে। অংক, বাংলা, বিজ্ঞান বিষয় যাই হোক, আপনাকে কিছু তথ্য মনে রাখতেই হবে।

বিখ্যাত স্মৃতিশক্তি বিশেষজ্ঞ হ্যারি লোরেন (Harry Lorayne) বলেছেন, ভাল মেমোরী, খারাপ মেমোরী বলে কিছু নেই। মেমোরী দু'ধরনের–ট্রেইন্ড আর আনট্রেইন্ড। কোন কিছু মনে রাখতে হলে আপনাকে মনে রাখার কৌশলগুলো জানতে হবে এবং সেগুলোকে ব্যবহার করা শিখতে হবে। যে কোন তথ্যকে মনে রাখার তিনটি ধাপ আছে–

১। তথ্য সংগ্রহ

২। তথ্য সাজানো বা জমা করা

৩। তথ্যকে কাজে লাগানো।

তথ্য সংগ্রহ করার ক্ষমতা মোটামুটি সবারই সমান। আপনি আপনার জীবনে ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনাই ব্রেনে সংরক্ষণ করে রাখছেন। কিন্তু, তা মনে করতে হলে দরকার তথ্যগুলোকে সাজিয়ে সংরক্ষণ করা। ধরুন, আপনি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় লাইব্রেরীতে গিয়েছেন একটা বই খুঁজতে। দেখবেন, লাইব্রেরীতে ঢোকার মুখেই বইয়ের ক্যাটালগ আছে। প্রথমে বিষয়ের উপর, তারপর লেখকের নাম, তারপর বইয়ের নাম অনুসারে সাজানো আছে। তাই, আপনি অতি সহজেই বইটা বের করে ফেলতে

পারছেন। কিন্তু, যদি এমন হতো যে, লাইব্রেরীটাতে গুদামঘরের মত সবগুলো বই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা, তা হলে আপনার কাঙ্ক্ষিত বই খুঁজে বের করতে কতক্ষণ লাগবে? আপনার ব্রেন এমনই এক সমৃদ্ধ লাইব্রেরী। এতে শুধু তথ্য নয়, ভিডিও, গানবাজনা সবই সংরক্ষিত আছে। এখন যদি আপনি তাদের অগোছালোভাবে সাজিয়ে রাখেন, তা হলে তা আপনার কোন কাজে আসবে না।

মেমোরী হচ্ছে বিভিন্ন তথ্যের মাঝে সংযোগ। আপনাকে নতুন কোন তথ্য মনে রাখতে হলে পুরানো তথ্যের সাথে তাকে যোগ করুন। তা হলেই মনে রাখাটা সহজ হবে। ধরুন, এমন একজনের সাথে আপনার আলাপ হলো যার নাম হানিফ। আপনি জানেন, হানিফ সংকেত জনপ্রিয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ইত্যাদির উপস্থাপক। এখন, আপনি তাঁর সাথে এ লোকটার তুলনা করুন। ইনি কি হানিফ সংকেতের মত সুন্দর করে কথা বলতে পারেন? তাঁর সাথে হানিফ সংকেতের মিল আর অমিল কোথায়? দেখবেন, পরবর্তীতে এ লোকের সাথে দেখা হলেই আপনি মনে করতে পারবেন তাঁর নাম হানিফ।

আপনি হয়তো ফটোগ্রাফিক মেমোরীর কথা শুনেছেন। Hypernesia (ফটোগ্রাফিক মেমোরী) বিশেষজ্ঞরা দেখেছেন, যাঁরা এ ক্ষমতার অধিকারী তাঁরা কতগুলো বিশেষ নিয়ম পালন করে নিজেদের মাঝে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করেন যে, তখন তাঁরা যাই দেখেন, তাই মনে রাখতে পারেন। আর আপনি যদি কোন কিছুকে অভ্যাসে পরিণত করেন তা হলে তা নিজে নিজেই হতে থাকে। যেমন–কসাইকে দেখুন, মাংস টুকরো করার সময় কত দ্রুত কাজ করেন। সেকেন্ডের ভগ্নাংশের এদিক সেদিক হলেই তাঁর হাত ধারালো অস্ত্র দিয়ে কেটে যাবে। কিন্তু, অভ্যাস তাঁদের এতটা নিশ্চিত করেছে। এ মেমোরীতে প্রিন্সিপালের ৭টা নিয়ম আছে। আপনি যদি ঠিকমত চর্চা করেন হয়তো একদিন আপনিও হয়ে উঠবেন ফটোগ্রাফিক মেমোরীর অধিকারী। তা হলে

চলুন, প্রথম নিয়মটা জেনে নেই–

১. Visualization বা দেখা

দেখা হলো মনে রাখার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র। আমাদের মন চিন্তা করে ছবি আর শব্দের মাধ্যমে। তবে, ছবির ক্ষমতা মনে রাখার ক্ষেত্রে অনেক বেশি শক্তিশালী। প্রমাণ চান? তা হলে, যে কোন পাঠ্যবই খুলে দু'ঘণ্টা পড়ুন। কোন রিপিট করবেন না। এবার, দু'ঘণ্টা আপনার প্রিয় নায়কের একটা ছবি দেখুন। এবার কী পড়লেন তা মনে করুন। আর কী দেখলেন তা মনে করুন। পার্থক্যটা হবে পাহাড় প্রমাণ। আপনার পাঠ্যবইয়ের দু'তিন লাইনের আবছা আবছা স্মৃতি মনে আসছে আর ছবির কাহিনি আপনি বলতে পারছেন সবটাই। যদি গল্পের বই পড়েন, তা হলে আপনি কল্পনা করেন দেখে কিছু ঘটনা মনে করতে পারবেন। কিন্তু লাইন বাই লাইন বলতে পারবেন না। তাই, Visualization সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

২। Association বা পারস্পরিক সম্পর্ক

যে কোন তথ্য মনে রাখবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হলো, সম্পর্ক স্থাপন করা। নিজের আগে থেকে জানা তথ্যের সাথে নতুন তথ্যের মিল আর অমিল লক্ষ করলেই মনে রাখা সহজ হয়। যেমন: পদার্থবিদ্যার কৌণিক গতিসূত্র বুঝতে হলে প্রথমে জানতে হবে সাধারণ গতিসূত্র এবং অবশ্যই গতি বলতে কী বোঝায়? সাধারণ গতিসূত্র জানা থাকলে, তার সাথে কৌণিক কী পরিবর্তন ঘটে, তা জানলেই কৌণিক গতিসূত্র মনে রাখা সহজ হয়।

৩। কোন ঘটনাকে অসাধারণভাবে উপস্থাপন করা

আমি যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করি, শেষ জন্মদিনে কী

খেয়েছিলেন, বলতে পারবেন? যদি গত একমাসের ভেতর আপনার জন্মদিন থাকে, তা হলে হয়তো পারবেন। এবার, মনে করুন, গত জন্মদিনে আপনার চোখ বেঁধে বন্ধুরা একটা জিনিস খেতে বলল। খুব খুশি হয়ে মুখে দিতেই আঁতকে উঠলেন। কারণ, সেটা ছিল একটা জ্যান্ত তেলাপোকা। এবার কি আপনি ভুলতে পারবেন? যদি, আরও ৫০ বছর পার হয়ে যায়, তবুও এ ঘটনা মনে থাকবে। তাই, কোন ঘটনা মনে রাখতে হলে অসাধারণ কিছু তৈরি করতে হবে।

৪। কল্পনা

কল্পনা আমাদের মনে রাখার ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। কোন তথ্য মনে রাখার জন্য আপনার কল্পনা আর সব কটা ইন্দ্রিয়ের সাহায্য নিন। ধরুন, আপনার মনে রাখতে হবে, কলা। তা হলে কল্পনা করুন, একটা কলা। দেখুন, এটা কি সবুজ না হলুদ? এর আকৃতি, গন্ধ অনুভব করুন। এবার স্পর্শ করুন। এর খোসা ছিলে খেয়ে ফেলুন। দেখুন, এটা কি মিষ্টি, ভেজা না স্যাঁতসেঁতে? ব্যবহার করুন আবেগকে। কলা খেয়ে আপনার মনে আনন্দ হচ্ছে। আপনার পঞ্চইন্দ্রিয়–দেখা, শোনা, স্পর্শ, ঘ্রাণ, স্বাদ, আপনার সব আবেগ, রাগ, ঘৃণা, হতাশা, আনন্দ সবকিছুকে ব্যবহার করুন তথ্য মনে রাখার জন্য। কারণ, আপনি যত বেশি দিক থেকে তথ্যকে মনে রাখতে চেষ্টা করবেন, ততই আপনার নিউরোকানেকশন সবল হতে থাকবে। ফলে, আপনার স্মৃতি হয়ে যাবে ফটোগ্রাফিক।

৫। রং

আপনার কল্পনায় আর নোটে বিভিন্ন রংয়ের ব্যবহার আপনার স্মৃতিশক্তিকে ৫০ গুণ বাড়িয়ে দেয়।

৬। ছন্দ

মনে রাখবার আরেকটা ভাল মাধ্যম হলো ছন্দ। একটু ভেবে দেখুন, কোন চেষ্টা ছাড়াই, নতুন গানের দু'চার লাইন আপনি মনে রাখতে পারেন। ছোটবেলায় শেখা অনেক ছড়া আজও আপনি মনে রেখেছেন। তাই ছন্দ ব্যবহার করুন এবং নিজেই উদ্ভাবন করুন।

৭। সমন্বয় সাধন

সম্পূর্ণতার ধারণা আপনার মনে রাখার ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেয়। একটা চ্যাপ্টারের সম্পূর্ণ ধারণাকে একীভূত করে নোট তৈরি করলে সেটা আপনার জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে। আজকাল অনেকেই একটা চ্যাপ্টারের দু'তিনটা প্রশ্ন পড়েই পরবর্তী চ্যাপ্টারে চলে যান। এতে যে ভাসা-ভাসা জ্ঞান লাভ হয় তার পরিণতি ভয়ঙ্কর। আমি নিজেও এভাবে পড়তাম। তাই, ভাল নম্বর পেলেও মনের ভেতর খচখচ করত যে, কিছুই তো শিখতে পারলাম না। তাই, নিজের বিবেকের কাছে মুক্ত থাকতে হলে সমন্বিত ধারণা নিয়ে পড়তে হবে।

এ সাতটি পদ্ধতিকে একীভূত করে পড়া কীভাবে সম্ভব তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে Mind Mapping অধ্যায়ে। এখন দেখুন, এর কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবহার।

লিংক পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে কিছু নির্দিষ্ট শব্দ বা Main points-গুলোকে মনে রাখা সহজ হয়। এর মাধ্যমে আপনার কল্পনা ব্যবহার করে Key word-গুলো মনে রাখা হয়। এতে আছে দু'টো স্টেপ–দেখা আর সম্পর্ক স্থাপন।

১। দেখা

যে তথ্য আপনি মনে রাখতে চান তার একটা ছবি কল্পনার

চোখে দেখুন। যেমন, কলম শব্দটা মনে রাখতে হলে কল্পনা করুন একটা কলম। এবার দেখুন, এটা কোন্ কোম্পানীর, বল পয়েন্ট না জেল, লেখা কি মসৃণ না খসখসে ইত্যাদি। যদি ১০টা শব্দ মনে রাখতে হয় তাদের আলাদা আলাদাভাবে মনে করুন।

২। সম্পর্ক স্থাপন

এবার আপনাকে এ দশটা শব্দের মাধ্যমে একটা গল্প বানাতে হবে। মনে করুন, আপনি একজন ফিল্ম ডাইরেক্টর। আপনার এখন ছবি বানাতে হবে। গানের সুর বা ছন্দে অথবা ঘটনায় আপনার কল্পনার মুভি বানিয়ে ফেলুন।

উদাহরণ

ধরুন, বাজার থেকে আপনাকে নীচের ১২ টা জিনিস আনতে হবে।

১. ডিম	৫. চা পাতা	৯. আলু
২. গরুর মাংস	৬.টমেটো	১০. কলম
৩. তোয়ালে	৭. সাবান	১১. খাতা
৪. গুঁড়ো দুধ	৮. টুথব্রাশ	১২. চিনি

এবার, প্রথম ধাপ। প্রতিটা জিনিসকে আলাদা আলাদা ভাবে কল্পনা করুন। আপনার সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করুন। এবার, আপনি আমার গল্পটা কল্পনা করুন।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই আয়নাতে দেখতে পেলেন আপনি হয়ে গেছেন জেমস বন্ড। আপনি এখন অবস্থান করছেন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে। ঝকঝকে নতুন **টুথব্রাশ** দিয়ে দাঁত মেজে, সুগন্ধি **সাবান** দিয়ে গোসল করে, **তোয়ালে** জড়িয়ে আরাম করে হেলান দিলেন সোফায়। এবার, রুম সার্ভিসকে ফোন করে বললেন নাস্তা দিতে। এর ফাঁকে জরুরী একটা চিঠি লিখতে হবে। হোটেলের **খাতায় কলম** দিয়ে দ্রুত লিখে ফেললেন। এবার,

পোশাক পরে রেডি হতেই বেয়ারা খাবার নিয়ে আসল। আপনার ঘর ভরে গেছে **গরুর মাংসের** গন্ধে। প্লেটের উপর সুন্দর করে সাজানো আছে স্লাইস করা **ডিম, আলুভাজা** আর **টমেটোর** সালাদ। খাওয়া শেষ করে **চা** তৈরি করলেন টি ব্যাগ, গুঁড়ো **দুধ** আর **চিনি** দিয়ে। এবার চা খেয়েই বেরিয়ে পড়লেন নতুন অ্যাডভেঞ্চারে।

এবার বইটা বন্ধ করুন। বলুন তো, বাজারের লিস্টে কী কী আছে? কিছু বাদ পড়ছে কি?

হ্যামিল্টনের পদ্ধতি

বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ডন হ্যামিল্টন (Dawn Hamilton) কোন বিষয় দীর্ঘদিন মনে রাখার জন্য সাতটি ধাপে পড়তে বলেছেন। সেগুলো হলো:

(১) Break the information into small segments. অর্থাৎ পড়ার বিষয়গুলোকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে ফেলুন।

(২) Attach meaning to information.
প্রতিটি তথ্যকে বোঝার চেষ্টা করুন।

(৩) Make it interesting.
তথ্যগুলোকে আকর্ষণীয়ভাবে সাজান।

(৪) Use imagination.
কল্পনা করুন।

(৫) Actively engage brain.
অর্থাৎ পড়ুন, লিখুন, নোট তৈরি করুন।

(৬) Reinforcement via repeatation.
বার বার পড়ে তথ্যগুলোকে স্মৃতিতে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করুন।

(৭) Be relaxed.
শান্তভাবে পড়ুন।

Abstract word কল্পনা

এমন কিছু শব্দ আছে যেগুলো কল্পনা করা অসম্ভব। ঘটনা তৈরি করাও প্রায় অসম্ভব। এসব ক্ষেত্রে যা করতে হবে, তা হলো, এ শব্দের সাথে মিল আছে এমন শব্দ বের করা। ধরুন, Chlorine শব্দটা আপনি চিন্তা করতে পারছেন না। এখন Crawling শব্দটা আপনি জানেন। এর মানে হামাগুড়ি দেওয়া। ভাবুন, একটা শিশু হামাগুড়ি দিচ্ছে। এখন যদি আপনি Crawling মনে রাখেন তা হলে Chlorine মনে রাখতে পারবেন। সুতরাং, আপনাকে কোন শব্দ মনে রাখতে হলে Key word বের করে সেগুলো দিয়ে একটা গল্প বানাতে হবে। কোন কিছুর বৈশিষ্ট্য মনে রাখার জন্য এ পদ্ধতি কার্যকর। এ ছাড়াও আপনি বৈশিষ্ট্যের প্রথম অক্ষরগুলো দিয়ে কবিতা বানিয়েও মনে রাখতে পারেন। তবে, বিশাল বিশাল চ্যাপ্টার মনে রাখতে হলে এ পদ্ধতি কার্যকর নয়। এর জন্য দরকার Mind Map®. আপনি যদি কোন চ্যাপ্টার থেকে Mind Map বানাতে পারেন তা হলে আপনার রিভিশন দেবার সময় আর Quality এতটাই চমৎকার হবে যে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। আর, পড়ালেখাটাও হবে একটা ছবি আঁকার মতই আনন্দময়। তা হলে, আর দেরি না করে চলুন শিখে নেই Mind Mapping®.

Mind Mapping by Tony Buzan.

নোট তৈরির অত্যাধুনিক নিয়ম

স্বাগতম। আপনাকে জানাচ্ছি অনেক অনেক শুভেচ্ছা এতদূর

পড়ার জন্য। বিশ্বব্যাপী রিসার্চের মাধ্যমে জানা গেছে যে, ৮০ ভাগ লোকই আত্ম-উন্নয়নমূলক বই কিনে দু'চ্যাপ্টারের বেশি পড়েন না। আপনি এতদূর চলে আসায় বোঝাই যাচ্ছে সাফল্যের জন্য আপনার আকাঙ্ক্ষা সীমাহীন। আপনি সেই ২০ ভাগ লোক, যারা সাফল্যের প্রশ্নে দৃঢ়সংকল্প। এদের মাঝে পড়েন বলে নিজেকেই বলুন, সাব্বাস! এই তো, কেমন একটা আনন্দ হচ্ছে না?

তা হলে চলুন, এবার পরিচিত হওয়া যাক নোট তৈরির সর্বাধুনিক অত্যাধুনিক কৌশলের সাথে। এজন্য আপনার পূর্বের চ্যাপ্টারগুলোর অনুশীলন কাজে লাগবে। Power Reading-এর মাধ্যমে Key word ও Key Idea বের করে এখন আপনাকে নোট বানাতে হবে অনন্য কায়দায়।

নোট তৈরিঃ A+ পাওয়ার উপায়

আমার পরিচিত হাজারখানেক ভাল ছাত্রের ভাল রেজাল্টের রহস্য হলো নোট। আর এ নোট তৈরি করতে হবে নিজেকেই। কোন স্যারের নোট ফটোকপি করে মুখস্থ করলেই ভাল ছাত্র হওয়া যায় না। এখন অধিকাংশ বিষয়ের প্রশ্নেই আপনার মতামত জানতে চাওয়া হয়। এ জন্যে, আপনার নিজস্ব মতামত জানানোর সুযোগ হেলায় হারিয়ে মুখস্থ লিখে আসা আপনার প্রতিভার প্রতি চরম অপমান। আপনি নিজে যে নোট বানাবেন সেটা হবে অনন্য। পৃথিবীর আর কেউ সম্পূর্ণ আপনার মত নোট বানাতে পারবে না। কিছু পার্থক্য থাকবেই। আর এ নোট তৈরি করতে কিছুটা সময় লাগলেও পরবর্তীতে এটা আপনার সময়কে বাঁচাবে বহুগুণ। আর, আপনার মনে রাখার ক্ষমতাও বেড়ে যাবে। তা হলে, নোট আপনাকে তিনভাবে সাহায্য করে—

১। সময় বাঁচায়
২। মনে রাখার ক্ষমতা বাড়ায়
৩। বোঝার ক্ষমতা বাড়ায়

এখন আমাদের দেশে যদি কাউকে নোট দেখাতে বলা হয়, ৯৯ ভাগ ছাত্রই যে নোট দেখাবে সেটা হলো ঐতিহাসিক বা চিরাচরিত পদ্ধতির নোট। কিন্তু, উন্নতবিশ্বে এখন স্কুল লেভেল থেকে পোস্ট গ্রাজুয়েশন পর্যন্ত, সবখানেই Mind Mapping®কে উৎসাহিত করা হচ্ছে। চিরাচরিত পদ্ধতির নোট সাধারণত দু'ধরনের।

উদাহরণ-১

এ পদ্ধতিতে পাঠ্যবইয়ের কিছু লাইন (Key Idea) সরাসরি তুলে আনা হয়। যেমন–

পদার্থের তিনটি রূপ

পদার্থের তিনটি অবস্থা। তা হলো–কঠিন, তরল ও বায়বীয়।

কঠিন পদার্থ

কঠিন পদার্থের অণুগুলো খুব কাছাকাছি থাকে। তারা সারিবদ্ধ ভাবে সজ্জিত। এ অণুগুলোর মধ্যেকার আকর্ষণ শক্তি তাদেরকে এক সাথে ধরে রাখে। এ অণুগুলো শুধুমাত্র তাদের অবস্থান থেকে কম্পিত হতে পারে।

তরল পদার্থ

তরল পদার্থের অণুগুলো দূরে দূরে থাকে। তাদের মধ্যে সাজানো অবস্থা নেই। তাদের আন্তঃআণবিক বল দুর্বল। তাই, তাদের নির্দিষ্ট আকার নেই। তাদের অণুগুলো পরস্পরের উপর চলাচল করে।

গ্যাসীয় পদার্থ

গ্যাসীয় পদার্থের অণুগুলো অনেক দূরে দূরে থাকে। তারা খুব দ্রুত চলাচল করে।

উদাহরণ-২

এ ধরনের নোট লেখা হয় পয়েন্ট করে। অধিকাংশ ভাল ছাত্রের নোটই হয় এরকম—

পদার্থের তিনটি রূপ

১। কঠিন পদার্থ

(ক) এর অণুগুলো কাছাকাছি ও সারিবদ্ধ অবস্থায় থাকে।

(খ) আণবিক বল অণুগুলোকে একত্রে ধরে রাখে।

(গ) অণুগুলো নিজের অবস্থানে থেকেই কম্পিত হয়।

২। তরল পদার্থ

(ক) অণুগুলো দূরে দূরে থাকে ও তাদের কোন সাজানো অবস্থা নেই।

(খ) আণবিক বল দুর্বল বিধায় নির্দিষ্ট আকার নেই।

(গ) অণুগুলো নিজেদের মাঝে চলাচল করতে পারে।

৩। বায়বীয় পদার্থ

(ক) অণুগুলো অনেক দূরে দূরে থাকে।

(খ) অণুগুলো খুব দ্রুতগতিতে চলাচল করে।

এ পদ্ধতির নোট পরীক্ষার খাতায় খুবই কার্যকরী, কিন্তু পড়া মনে রাখার ব্যাপারে এর তেমন কোন ভূমিকা নেই। একটু তাকিয়ে দেখুন, দেশে জিপিএ ৫ পাওয়ার সংখ্যা ৩০ হাজার হলেও গোল্ডেন জিপিএ ৫ পাচ্ছে মাত্র ২-৩ হাজার। আর এ ছাত্রগুলোই

দেশের প্রধান প্রধান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ার সুযোগ পাচ্ছেন। তা হলে, যারা এ সব নোট করেও ভাল নম্বর পাচ্ছেন না তার কারণ কী? আমি আগেই বলেছি নোট করার তিনটি উদ্দেশ্যের কথা। এ নোট তাদের একটিও পূরণ করছে না।

১। সময় বাঁচানো

এ নোটগুলো বোরিং। আপনি নিজে বানালেও দ্বিতীয়বার নোট পড়তে ইচ্ছে করে না। আর এটা আপনার সময়ও খুব একটা বাঁচায় না। আপনাকে, Key word এর যে Idea দিয়েছিলাম এটা তা ফলো করে না। ফলে, সেই ৮০ ভাগ Non-Key word আপনাকে মুখস্থ করতে হচ্ছে।

২। মনে রাখা

আপনাকে আগের চ্যাপ্টারে মনে রাখার যে ৭টি পদ্ধতি বলা হয়েছিল তা এ নোটে নেই।

৩। বোঝার ক্ষমতা

এ নোট আপনার পড়া বোঝার ক্ষমতা বাড়ায় না, বরং কমায়। কারণ অনেক Key word এসব নোটে বাদ পড়ে যায় যা হয়তো প্রয়োজনীয়। এ ছাড়া লক্ষণীয় যে—

১. চিরাচরিত এই সব নোটে কোন ছবি থাকে না।

২. এগুলো কালো বা নীল এ দু'টো কালি দিয়ে তৈরি করা হয়।

৩. কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকে Highlight করা হয় না।

৪. এ নোট দেখে একজনের পক্ষে কোন স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব নয়।

৫. এতে কল্পনারও কোন ব্যবহার নেই।

বেশিরভাগ ছাত্রই মনে রাখার যে সমস্যায় ভোগেন তার মূল কারণ এ প্রাচীন নোট পদ্ধতি। এতে সেই বাম ব্রেনের কাজই

চলতে থাকে। ডান ব্রেন পড়ে থাকে অকেজো। এখন তা হলে জেনে নিন, Mind Mapping কীভাবে আপনাকে সাহায্য করে।
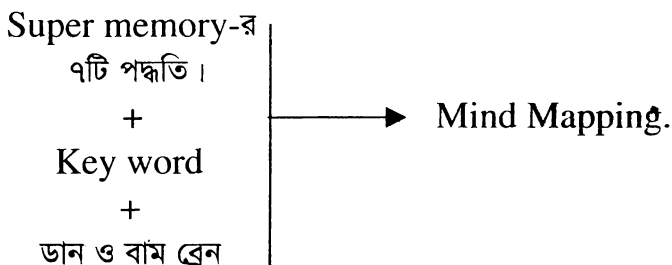
এটা আবিষ্কার করেছেন Tony Buzan.

এর সুবিধা

১. সময় বাঁচায়

এর মাধ্যমে ১০ পৃষ্ঠার তথ্য এক পৃষ্ঠায় নিয়ে আসা যায়। এমনকী ছোটখাটো একটা চ্যাপ্টারের সম্পূর্ণ তথ্যও এক পৃষ্ঠায় নিয়ে আসা সম্ভব। এতে আপনি শুধু key word ব্যবহার করছেন, ফলে কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বাদ পড়ছে না। এর প্রধান সুবিধা হলো, Mind Map আপনাকে আপনার বন্ধুদের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে রাখবে। ধরুন, আপনার বন্ধু যেখানে ৫০ পৃষ্ঠার একটা চ্যাপ্টার রিভিশন দিচ্ছেন, সেখানে আপনি পড়ছেন মাত্র ৫ পৃষ্ঠা আর মনে রাখতে পারছেন পুরোটাই। তাই, আপনার বন্ধু বা শত্রু যাই হোক, তিনি যা পড়বেন ৩ ঘণ্টায়, আপনি তা পড়বেন মাত্র ১৫ মিনিটে।
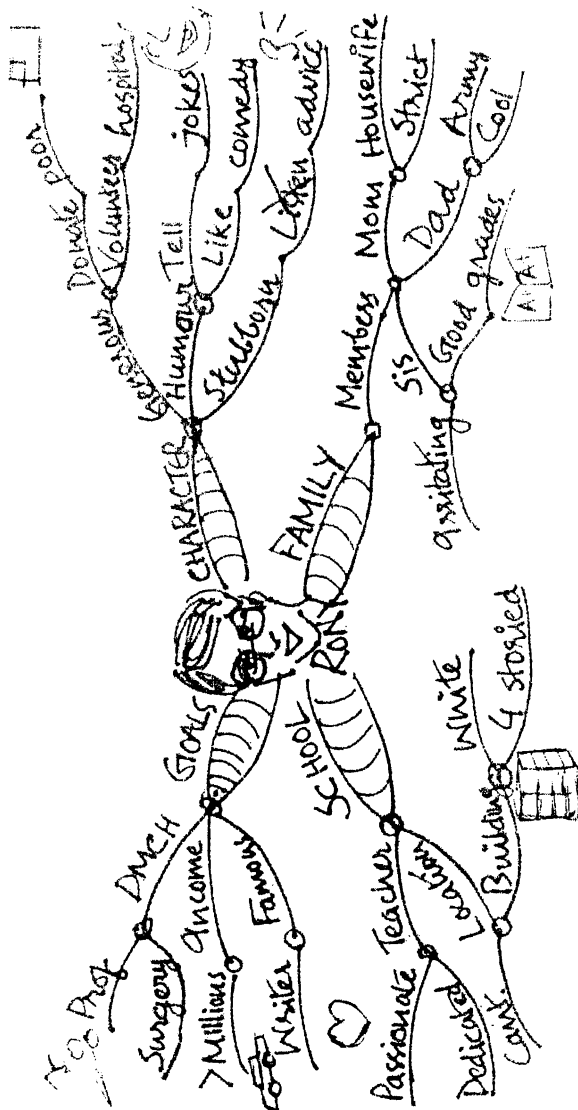
২. এটা মনে রাখার সাতটি পদ্ধতির সমন্বয়

Super memory-র সাতটি পদ্ধতির সমন্বয় হলো Mind Map. এতে আছে ছোট বড় নানান কিসিমের ছবি। এমনকী পুরো Mind Map-টাই বিচিত্র একটা ছবির মতন। এতে খুবই নির্দিষ্টভাবে তথ্যগুলোকে সুবিন্যস্ত করা হয়, যাতে তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক সহজেই বোঝা যায়। বোরিং শব্দ বাদ দিয়ে শুধুমাত্র Key word-গুলোকে নানা রংয়ের মাধ্যমে সাজানো হয়। ফলে, আপনার মন তাকে সহজেই মনে রাখতে পারে। এটা আপনার কল্পনা, সৃষ্টিশীলতা আর ছন্দের মাঝে সমন্বয় সাধন করে এবং পুরো বিষয়ের একটা সুনির্দিষ্ট ধারণা প্রদান করে, যা আপনার পড়া বুঝতে আর মনে রাখতে দারুণ কার্যকরী। Mind Map তৈরির সময় আপনার ব্রেনের উভয় অংশ একসাথে কাজ করে। তাই, আপনি যদি জিনিয়াস হতে চান, তা হলে প্রচুর Mind Map তৈরি করুন। এখন চলুন শিখে নিই Mind Map তৈরির নিয়মগুলো। প্রথমে একটা ডিমাই বা A 4 সাইজের কাগজ নিন। আপনি নিজেকে নিয়েই প্রথম Mind Map তৈরি করুন। যদি আপনার নাম হয় রনি, তা হলে আপনার Mind Map-এর নামও হবে রনি। এ Mind Map-টি উদাহরণ হিসেবে আগের পৃষ্ঠায় দেওয়া হয়েছে।

ধাপ:১

পৃষ্ঠাটা থাকবে আড়াআড়িভাবে এবং বিষয়ের নাম থাকবে কেন্দ্রে।

নিয়ম

১. কেন্দ্রের বিষয়কে যেমন খুশি রং দিতে পারেন।
২. এর কোন বর্ডার বা বক্স দেবেন না।
৩. যদি এমন কোন বিষয় থাকে যার ছবি আঁকা সম্ভব নয়, তা হলে শব্দটাকেই নানা রং দিতে পারেন।

৪. বিষয়ের আয়তন আপনার বুড়ো আঙুলের উপরের ভাগের সমান বা ছোট হবে, বেশি বড় যেন না হয়।

ধাপ: ২ প্রধান শাখা যোগ করুন

এই ধাপে Sub-heading যোগ করুন।

নিয়ম

১. অবশ্যই বড় হাতের অক্ষরে লিখতে হবে। যদি বাংলায় লেখেন তা হলে একটু বড় আকারের শব্দ লিখুন।

২. প্রতিটি প্রধান শাখা কেন্দ্রের সাথে যুক্ত থাকবে যেভাবে ফ্যানের ব্লেড বা পাখাগুলো কেন্দ্রের সাথে যুক্ত থাকে।

৩. শাখাগুলো পরস্পরের সাথে কখনোই সমান্তরাল হবে না। একটি প্রধান শাখার সবগুলো তথ্য লেখার পর দ্বিতীয় শাখা শুরু করবেন।

ধাপ: ৩

প্রতিটি প্রধান শাখার সাথে Main point বা Key word যোগ করুন।

নিয়ম

১. শুধু Key word বা ছবি ব্যবহার করতে হবে।

২. বিভিন্ন ধরনের চিহ্ন ব্যবহার করতে পারেন।

আপনি নিজের উদ্ভাবিত চিহ্ন ব্যবহার করতে পারেন। আমি কিছু উদাহরণ দিচ্ছি।

Not available	~~available~~
without	w/o
Because	
For	4
Cause	→

৩. প্রতিটি Key word বা ছবি একটি মাত্র লাইনে থাকবে।

৪. সর্বোচ্চ একটি শব্দ এক সরলরেখায় থাকবে।

৫. সব শাখা একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে বের হবে।
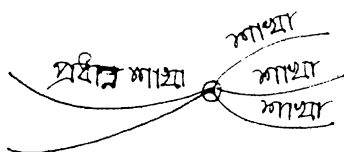
৬. প্রতিটি শাখা যে কেন্দ্র থেকে বের হবে তারা একই রংয়ের হবে।
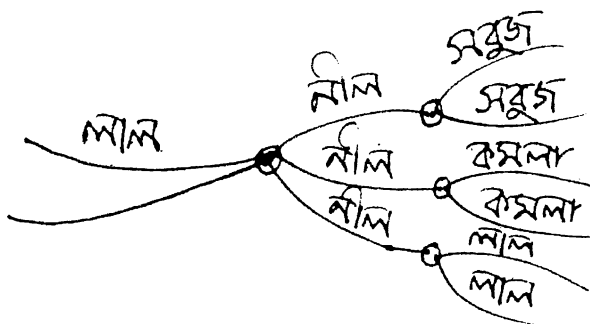
৭. একটি শাখা থেকে পরবর্তী শাখায় যেতে রং বদলাতে হবে।
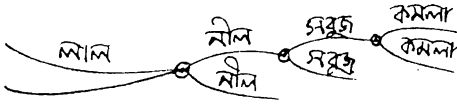
৮. Mind Map-এ তথ্যপ্রবাহ হবে ঘড়ির কাঁটার দিকে।

আপনাদের অবশ্যই মনে রাখতে যে, Mind Map কোন সারাংশ নয়। এতে প্রধান তথ্যগুলো Key word-এর মাধ্যমে সাজানো থাকে। প্রতিটি তথ্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। যেমন–এই Mind Map-এ Generous কথাটার বর্ণনায় টাকা দান বা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করার কথা বলা হয়েছে।

বিঃ দ্রঃ Mind Map তৈরি করা হয়েছে কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে। কাজেই তা এমনভাবে বানাতে হবে যেন ডানদিকের শাখা বাম থেকে ডানে ও বামদিকের শাখা ডান থেকে বামে পড়া যায়।

ধাপ-৪: তথ্যপ্রবাহ

এ ধাপে আপনি আপনার কল্পনাকে লাগামছাড়া করে দিন। যে কোন তথ্যকে ছবিতে আঁকার চেষ্টা করুন তা যতই সুন্দর বা বীভৎস হোক না কেন। এটা আপনার মনে গেঁথে যাবে।

এতক্ষণ যাবৎ যদি আপনি স্টেপগুলো বুঝে আপনার Mind

Map তৈরি করতে পারেন, তা হলে এবার আমি আপনাদের জানাচ্ছি এর কার্যকারিতা সম্পর্কে। Mind Map আপনার ক্ষমতাকে কতখানি সমৃদ্ধ করবে তা আপনি এখনই বুঝতে পারবেন। নীচের আর্টিকেলটা পড়ুন এবং মনে রাখার চেষ্টা করুন।

পদার্থের তিনটি রূপ

পদার্থের মূল রূপ তিনটি। যথা–কঠিন, তরল ও বায়বীয়।

কঠিন পদার্থ

কঠিন পদার্থের অণুগুলো সারিবদ্ধ অবস্থায় সজ্জিত থাকে। তারা থাকে খুব কাছাকাছি। তাদের মধ্যেকার দূরত্ব এত কম থাকে যে, চাপ দিয়ে ছোট করা যায় না। তাদের এই নির্দিষ্ট স্থানে থাকার মূল কারণ হলো শক্তিশালী আন্তঃআণবিক বল। যার ফলে, তাদের শুধু নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে কম্পন সম্ভব।

এই আন্তঃআণবিক বল তৈরি হয় আকর্ষণ ও বিকর্ষণ বলের মাধ্যমে। আকর্ষণ শক্তি অণুগুলোকে মুক্ত হতে বাধা দেয়। আর বিকর্ষণ শক্তি বাধা দেয় অণুগুলোকে একীভূত হয়ে যেতে। যার ফলে কঠিন পদার্থের নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন আছে।

যখন এতে তাপ দেওয়া হয়, অণুগুলোর শক্তি বেড়ে যায়। ফলে, তাদের কম্পন বেড়ে যায়। ফলে, অণুগুলোর মধ্যেকার দূরত্ব এবং পদার্থের আয়তন বেড়ে যায়।

তরল পদার্থ

তরল পদার্থের অণুগুলো কঠিন পদার্থের তুলনায় দূরে দূরে

থাকে। কিন্তু, তা সত্ত্বেও এদের চাপ দিয়ে ছোট করা যায় না। এদের মধ্যেকার আন্তঃআণবিক বল কঠিন পদার্থের মত শক্তিশালী নয়। তরল পদার্থের অণুগুলো পরস্পরের উপর চলাচল করতে পারে। তাই, তরল পদার্থের কোন নির্দিষ্ট আকার নেই এবং তাদের যে পাত্রেই রাখা হোক না কেন তারা সেই পাত্রের আকার ধারণ করে। যখন এতে তাপ দেওয়া হয় তখন অণুগুলো অনেক দ্রুত কম্পিত হয় এবং এদিক সেদিক ছুটোছুটি করে। ফলে, তরল পদার্থ আয়তনে বৃদ্ধি পায়।

বায়বীয় পদার্থ

বায়বীয় পদার্থের অণুগুলো আরও দূরে দূরে থাকে। ফলে, তাদের মধ্যে অনেক ফাঁকা জায়গা থাকে। বায়বীয় পদার্থকে চাপ দিয়ে ছোট করা যায়। এর অণুগুলো অনেক দ্রুত ছুটোছুটি করে এবং পরস্পরের সাথে ও পাত্রের গায়ে ধাক্কা খায়। এই ধাক্কা খাওয়ার সময় তাদের আন্তঃআণবিক বল কাজ করে। এ আন্তঃআণবিক বলের মান কম বলে তাদের নির্দিষ্ট কোন আকার ও আয়তন নেই।

এবার বইটা বন্ধ করুন। একটা খাতা নিন। সেখানে লিখে ফেলুন কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থ সম্পর্কে আপনার কতগুলো তথ্য মনে আছে। প্লীজ, লিখুন। লেখা শেষ হলে এবার মেলান।

আপনি একটু লক্ষ করলেই দেখতে পাবেন, কঠিন পদার্থ সম্পর্কে আপনি লিখতে পেরেছেন সবচেয়ে বেশি। তরল ও বায়বীয় পদার্থে কিছু তথ্য বাদ পড়েছে। এবার দেখুন, Mind Map-এর ক্ষমতা। আমি শুধু কঠিন পদার্থের Mind Map বানিয়ে দিচ্ছি। বাকিগুলো আপনি তৈরি করুন। প্রথমেই Key

word বের করুন।

কঠিন পদার্থ

কঠিন পদার্থের অণুগুলো সারিবদ্ধ অবস্থায় সজ্জিত থাকে। তারা থাকে খুব **কাছাকাছি**। তাদের মধ্যেকার **দূরত্ব** এত **কম** থাকে যে, **চাপ** দিয়ে তাদের **ছোট করা যায় না**। তাদের এ **নির্দিষ্ট স্থানে** থাকার মূল **কারণ** হলো শক্তিশালী **আন্তঃআণবিক বল**। যার ফলে, তাদের শুধু **নির্দিষ্ট স্থানে** দাঁড়িয়ে **কম্পন** সম্ভব।

এ **আন্তঃআণবিক বল তৈরি** হয় **আকর্ষণ** ও **বিকর্ষণ বলের** মাধ্যমে। **আকর্ষণ** শক্তি **অণুগুলোকে মুক্ত** হতে **বাধা** দেয়। আর, **বিকর্ষণ শক্তি বাধা** দেয় অণুগুলোকে **একীভূত** হয়ে যেতে। যার ফলে, **কঠিন পদার্থের নির্দিষ্ট আকার** ও **আয়তন** আছে।

যখন, এতে **তাপ** দেওয়া হয়, **অণুগুলোর শক্তি বেড়ে** যায়। ফলে, তাদের **কম্পন বেড়ে** যায়। ফলে, অণুগুলোর মধ্যেকার **দূরত্ব** ও পদার্থের **আয়তন বেড়ে** যায়।

(১) ধাপ-১: সাদা কাগজের মাঝামাঝি বিষয়টাকে লিখুন।

(২) ধাপ-২: প্রধান শাখা যুক্ত করুন। আগেই তিনটি শাখা লিখে ফেলবেন না। একটি শাখার সম্পূর্ণ তথ্য শেষ করে পরবর্তী শাখায় যাবেন।

(৩) ধাপ-৩, ৪: প্রধান Key word যোগ করুন এবং চিহ্ন ও ছবি যোগ করুন।

Mind Map টা সম্পূর্ণ হবার পর আবার খাতা নিন। এবার লিখুন। দেখুন, কতগুলো তথ্য আপনি মনে রাখতে পারছেন। আপনি যখন রিভিশন দেবেন, তখন আপনার নিজের তৈরি এ
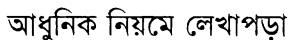
নোট আপনাকেই আনন্দ দেবে আর এটা মনে থাকবে অনেক, অনেক দিন। আপনার পাঠ্যবই থেকে এখনই একটা Mind Map বানিয়ে ফেলুন। মোট তিনটা Mind Map যদি আপনি এখনই তৈরি করেন তা হলে এটা তৈরির Idea আপনার মাঝে চলে আসবে। আপনার বইয়ের চ্যাপ্টারগুলোর ১০ পৃষ্ঠার তথ্য একটা Mind Map-এ হয়ে যাবে। এটা বানানোতে আপনার আছে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। তবে নিয়মগুলো মাথায় রাখবেন। কারণ, তা আপনার ব্রেনের বিভিন্ন অংশকে কাজে লাগানোর জন্য তৈরি করা হয়েছে। তা হলে, বন্ধু, চলুন Next অধ্যায়ে।

মেমোরী প্যাটার্ন

পৃথিবীর আর সব চক্রের মত আমাদের মেমোরীরও আছে নির্দিষ্ট চক্র। আপনি হয়তো দেখবেন, এমন কিছু সময় আছে, যখন পড়া শুরু করলে খুব দ্রুত পড়া হয় এবং বেশ ভাল মনে থাকে। আবার, এমন কিছু সময় আছে, যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা বই নিয়ে বসে থাকলেও কিছু পড়া হয় না। কিন্তু, আমাদের ক্ষমতা আছে এর সঠিক ব্যবহারের। আর, সেটা জানতে হলে চলুন আগে জেনে নেয়া যাক, আমাদের মেমোরীতে কী কী তথ্য, কীভাবে জমা হয়।

তা হলে, খাতা কলম নিয়ে বসুন। নীচে কতগুলো এলোমেলো ইংরেজী শব্দ আছে। আপনি মাত্র একবার চোখ বুলিয়ে খাতায় লিখে ফেলবেন। সিরিয়ালি না লিখলেও চলবে।

দেখুন, ৩৩টা শব্দের মাঝে আপনি কতগুলো মনে রাখতে পেরেছেন। তবে, মনে রাখুন, একবারের বেশি শব্দগুলো দেখবেন না।

Right	May	To
From	is	Far.
Five	Why	For.
Him	The	is.
Cute	of	Left.
The	is	The.
Sore	Been	Maize
is	The	Ring.
The	Santa Claus	Baby.
Row	Can	goal.
The	The	Roller.

এখন, খাতায় নম্বর দিয়ে লিখে ফেলুন। আবার দেখবেন না। এবার যে শব্দগুলো লিখেছেন সেগুলো ভালভাবে লক্ষ করুন। কেন আর কীভাবে আপনি এ শব্দগুলো মনে রেখেছেন–

১. একেবারে প্রথম দিকের কিছু শব্দ আপনি মনে রেখেছেন।
২. একেবারে শেষদিকের কিছু শব্দ আপনি লিখতে পেরেছেন।
৩. যে শব্দগুলো একাধিকবার আছে সেগুলো মনে আছে।
৪. অন্যধারার শব্দ, যেমন–Santa Claus মনে আছে।
৫. একই ধরনের সম্পর্কযুক্ত শব্দ যেমন–Right, Left আপনার মনে আছে।

বিজ্ঞানীরা অনেক গবেষণা করেই এ তথ্য বের করেছেন। তাঁরা দু'ঘণ্টার পড়াকে পর্যালোচনা করে দেখেছেন পড়ার শুরু আর শেষের দিকের অংশ বেশি মনে থাকে। এটাকে গ্রাফ হিসেবে দেখালে,
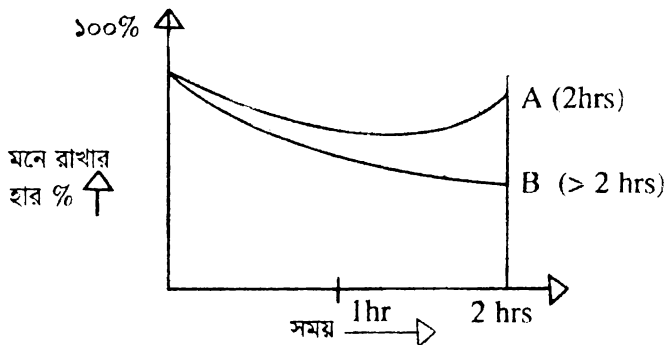
এ গ্রাফ থেকে দেখা যায়, পড়া শুরুর কিছুক্ষণ পরেই মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হতে শুরু করে এবং মাঝামাঝি সময়ে যা পড়া হয় তার প্রায় পুরোটাই আমরা ভুলে যাই। এবং যদি দু'ঘণ্টার বেশি পড়া হয় একটানা, তা হলে শেষের দিকে ভাল মনে রাখার যে Peak সেটাও থাকে না। ফলে, বুঝতেই পারছেন, একটানা অনেকক্ষণ পড়লে আপনার কোন লাভ হচ্ছে না। আর, অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য পড়া শুরু করলে, সামান্য পড়েই আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তা হলে কীভাবে পড়বেন আর কতক্ষণ পড়বেন?

বিজ্ঞানীরা একটা আদর্শ স্টাডি সেশনকে দু'ঘণ্টা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এ দু'ঘণ্টার পড়াকে চারটি ভাগে ভাগ করতে হবে। প্রতিটি ভাগ হবে ২৫ কিংবা ৩০ মিনিটের। প্রতিটি ভাগের পর ৫ মিনিট বিশ্রাম থাকবে। এ সময় আপনি পানি খেতে বা বিশ্রাম নিতে পারেন। এভাবে পড়লে আপনার মনে
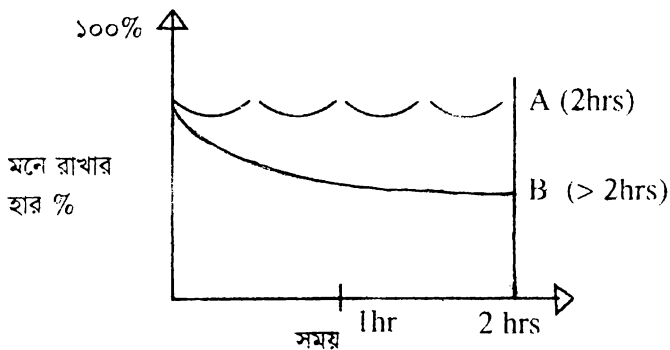
রাখার গ্রাফ হবে-

এতে দেখা যায়, টানা দু'ঘণ্টা পড়লে যেখানে আপনার মনে রাখার Peak/সর্বোচ্চ লেভেল থাকত ২টি, সেখানে এ পদ্ধতিতে থাকছে ৮টি। এর অর্থ আপনি এভাবে পড়লে আগের চেয়ে ৪ গুণ বেশি তথ্য মনে রাখতে পারবেন। মনে রাখবেন, প্রতি দু'ঘণ্টা স্টাডি সেশনের পর কমপক্ষে ৩০ মিনিট বিরতি নিয়ে আবার পড়তে বসবেন।

অনেক ছাত্র দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, পরীক্ষার কিছুদিন আগেই পড়া শুরু করা উচিত। আগে শুরু করে কোন লাভ নেই। কারণ, আগের পড়া কিছুই মনে থাকে না। ফলে, এসব ছাত্রের প্রধান সমস্যা দাঁড়ায় পরীক্ষার আগে রিভিশন দিতে গিয়ে। তাঁরা বাজে রেজাল্ট করার পর ভাবেন, এত পড়েও আমাকে দিয়ে কিছুই হলো না। অনেক টেনশনের মধ্যে যে পড়া হয়, সেটা মনেও থাকে খুব অল্প সময়। তাই, তাঁরা পরীক্ষার হল থেকে বের হয়েই দেখতে পান, অধিকাংশ পড়াই ভুলে গেছেন। কারণ, ব্রেন স্বল্প সময়ের জন্য অনেক তথ্য মনে রাখতে পারে, আপনি সেগুলোই পরীক্ষায় উগরে দিয়ে আসেন। ফলে, আপনার

পরীক্ষা পাস হলেও কিছুই শেখা হয় না। এসব ছাত্ররা বিপাকে পড়েন, Professional life-এ গিয়ে। কারণ, সেখানে পরীক্ষার নম্বরের চেয়ে জ্ঞান আর আত্মবিশ্বাসের বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়।

এজন্য আপনাকে বছরের শুরুতেই পড়া আরম্ভ করতে হবে। আর রিভিশন দিতে হবে নিয়ম মেনে। এজন্য আপনাকে জানাচ্ছি কখন ও কীভাবে রিভিশন দেবেন আর কীভাবে তা আপনার কাজে লাগবে–

আপনি যা পড়েন তার ৮০ ভাগ ভুলে যান প্রথম ২৪ ঘণ্টায়

আপনি যা পড়েন তা যদি ২৪ ঘণ্টার ভেতর রিভিশন না দেন তা হলে যা পড়ছেন তার ৮০ ভাগ ভুলে যাবেন। এভাবে, এক বা দু'সপ্তাহ পর ভুলে যাবেন সবটুকুই। ফলে, পরীক্ষা আসলে দেখবেন কিছুই মনে নেই। তাই, পরীক্ষার আগে আবার সব নতুন করে পড়তে হবে। ফলাফল হলো প্রচুর পরিশ্রম আর নিম্নমানের রেজাল্ট।

এ কারণেই অনেকে তাড়াতাড়ি সিলেবাস শেষ করতে চান না।

কারণ, জানা কথা, যা পড়েছেন তা পরীক্ষার আগে আবার নতুন করে পড়তে হবে। এ সমস্যা থেকে মুক্তির একটাই কার্যকর উপায় আছে। আর, তা হলো সঠিক সময়ে রিভিশন। আপনি যদি Key word ও Mind Map ব্যবহার করে পড়েন তা হলে প্রথমবার পড়তে যে সময় লাগবে, দ্বিতীয়বারে লাগবে প্রথমবারের ১০ ভাগের এক ভাগ। সাধারণত, একঘণ্টার পড়া রিভিশন দিতে সময় লাগে ১০ মিনিট। এ রিভিশন যথাসময়ে দিতে হবে। আমাদের ব্রেনে স্বল্পস্থায়ী ও দীর্ঘস্থায়ী মেমোরীর জন্য আলাদা

জায়গা আছে। স্বল্পস্থায়ী মেমোরীকে বারবার মনে করলে তা দীর্ঘস্থায়ী মেমোরীতে জায়গা করে নেয়। এ দীর্ঘস্থায়ী মেমোরীতে তথ্য জমা করতে প্রয়োজন চারটি রিভিশন।

প্রথম রিভিশন

আপনার দু'ঘণ্টা বিশ মিনিটের (বিশ্রামের সময়সহ) পড়ার সেশনের ১ ঘণ্টা ৫০ মিনিট পড়ার জন্য আর শেষ ১০ মিনিট রাখুন রিভিশনের জন্য। এ রিভিশন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আপনি দু'ঘণ্টায় যা পড়লেন তার তথ্যগুলোকে গোছানোর জন্য এ রিভিশন কার্যকরী। এ রিভিশন না দিলে আপনার এত কষ্টের পড়া মনে থাকবে না।

দ্বিতীয় রিভিশন

দ্বিতীয় রিভিশন দেবেন আপনার প্রথম রিভিশনের ২৪ ঘণ্টার ভেতর। ধরুন, আজ সন্ধ্যায় দু'ঘণ্টার স্টাডি সেশনে যা পড়লেন পরবর্তী দিন পড়া শুরু করার আগে ১০ মিনিট আজকের পড়া রিভিশন দিয়ে নিন। এ দু'টো রিভিশন দিলে আপনার ন্যূনতম ৫০ ভাগ পড়া মনে থাকবে।

তৃতীয় রিভিশন

এ রিভিশন দেবেন ঠিক একসপ্তাহ পর।

চতুর্থ রিভিশন

চতুর্থ বা শেষ রিভিশন দেবেন পরীক্ষার আগের দিন।

আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন, মেলা ঝামেলার ব্যাপার। এত রিভিশন দেয়ার সময় কই? তা হলে, নীচের চার্টটা দেখুন। যদি ২ ঘণ্টার

পড়ার রিভিশন ১০-১৫ মিনিট হয় তা হলে আপনার সময় খরচ হবে–

	৪টি রিভিশন	১টি রিভিশন
সময়	২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট	৩ ঘণ্টা ৩০ মিনিট
মনে রাখার সম্ভাব্যতা	৪ গুণ	

কারণ, যদি একবার পড়ে কোন রিভিশন না দেন, তা হলে আপনার দু'ঘণ্টার পড়া রিভিশন দিতে সময় লাগবে ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট। আর, যদি Mind Map বানাতে পারেন, তা হলে আপনার টেনশন অর্ধেক কমে যাবে আর রিভিশনও হবে আনন্দময়। এতে আপনার মনে রাখার ক্ষমতা এত বেড়ে যাবে যে, আপনি নিজেই অবাক হয়ে যাবেন। এখন, তা হলে চলুন জেনে নিই আপনার মনে রাখা তথ্যগুলোকে কীভাবে কাজে লাগাবেন।

মেমোরীকে কাজে লাগানো

এতগুলো চ্যাপ্টার অনুশীলন করে আপনার কনফিডেন্স নিশ্চয়ই আগের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু অনেক কিছু জানা থাকলেও পরীক্ষা দেবার পদ্ধতি না জানলে সব বৃথা। আমাদের মূল সমস্যা হলো একটা বই থেকে আমাদের ঠিক কোন্ তথ্যগুলো শিখতে হবে আর কীভাবে শিখতে হবে তা আমাদের কেউ বলে দেয় না। ক্লাসে টিচাররা মুখস্থ পড়া বলে যান। প্রাইভেট পড়ানো হয় শুধু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো। কিন্তু, কীভাবে শিখব, কেন শিখব আর তা

কী কাজে লাগবে তা আমরা বুঝতে পারি না। কিন্তু উন্নত বিশ্বে এবং উন্নয়নশীল বিশ্বে সবখানেই নির্দিষ্ট করে দেয়া আছে একজন ছাত্রের জ্ঞান লাভের জন্য কীভাবে পড়তে হবে। আপনাদের তা হলে আমি জানিয়ে দিচ্ছি ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড অভ টেক্সট বুক-এর বিধি। ছাত্রদের পড়ার বিষয় যাই হোক না কেন, নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে পাঠ্যবই লিখতে হবে। এ বিধি অনুযায়ী, একজন ছাত্র তার শিক্ষাজীবনে পাঠ্যবই থেকে যা শিখবে তা হলো–

১. তথ্যের মিল ও অমিল।
২. তথ্যের বিশ্লেষণ।
৩. কোন ঘটনার কারণ অনুসন্ধান ও বৈশিষ্ট্য।
৪. নির্দিষ্ট তথ্য বের করা এবং সাজানো।
৫. সিদ্ধান্ত নেয়া।
৬. সমস্যার সমাধান।
৭. তথ্যের বিস্তৃত বর্ণনা।
৮. তথ্যের নির্ভুলতা নির্ণয়।
৯. বিভিন্ন তথ্যের মাঝে সম্পর্ক নির্ণয় ও মতামত প্রদান।
১০. বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সমাধানে পৌঁছানো।

খুবই অগোছালো মনে হচ্ছে কি? আপনি তা হলে একটা সাদা কাগজে এ দশটি লাইন লিখে আপনার টেবিলের সামনের দেয়ালে বা টেবিলেই স্কচটেপ দিয়ে লাগিয়ে ফেলুন। এবার আপনার যে কোন পাঠ্যবই বের করুন। একটা চ্যাপ্টার খুলুন। এবার দেখুন এটা থেকে আপনাকে কীভাবে পড়তে হবে? পদার্থবিদ্যা দিয়েই উদাহরণ দিই। প্রথমে বিভিন্ন সংজ্ঞা দেয়া আছে। গতি, বল, বেগ ইত্যাদি। এখন চার্টের দিকে তাকান। আপনাকে জানতে হবে এ বিষয়গুলোর মিল আর অমিল। জানতে হবে সম্পর্ক। কীভাবে গতিসূত্রকে বলবিদ্যায় লাগাবেন। আপনাকে জানতে হবে তাদের বৈশিষ্ট্য। এদের সূত্র বের করা। সে সূত্রানুযায়ী কিছু সমস্যার

সমাধান। কোন সূত্রের বর্ণনা বা প্রমাণ। আপনার সূত্রের নির্ভুলতা নির্ণয়। এবং আপনার মতামত।

আপনি যদি একটা কবিতা পড়েন তা হলেও এ নিয়ম খাটবে। ধরুন, 'সোনার তরী' কবিতায় কবি নৌকার সাথে সময়ের কী তুলনা করেছেন। তাদের মিল ও অমিল, সম্পর্ক নির্ণয়। ঘটনার কারণ। নির্দিষ্ট তথ্য বের করা। যেমন–সোনার ধান বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন। সমস্যার সমাধান। বিশ্লেষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে আসা। আপনার মতামত।

তাই যে কোন চ্যাপ্টার পড়ার আগে আপনাকে এ ১০টি বিষয় মাথায় রাখতে হবে। পড়ার শুরুতেই চ্যাপ্টারের নাম দেখে শেষের প্রশ্নগুলো একটা খাতায় লিখে ফেলুন। যদি প্রশ্ন না থাকে তা হলে নোট বই বা পুরানো বর্ষের পরীক্ষার প্রশ্ন যোগাড় করে সেগুলো লিখে ফেলুন। এতে কি লাভ হবে জানেন? আপনার পড়া অনেক সহজ আর আকর্ষণীয় হয়ে যাবে। কারণ, প্রশ্ন জানা থাকায় আপনি বুঝে ফেলতে পারবেন কোন্ তথ্যগুলো আপনাকে মনে রাখতে হবে। তাই, অপ্রয়োজনীয় তথ্য বাদ দিতে পারবেন।

সুতরাং, কোন চ্যাপ্টার পড়ার সময় আপনাকে তিনটি কাজ করতে হবে।–

১. প্রশ্ন সংগ্রহ করে খাতায় লিখে ফেলুন।
২. উত্তরগুলো লিখে অভ্যাস করুন।
৩. বিগত বছরের প্রশ্ন অনুযায়ী বাসায় পরীক্ষা দিন। দরকার হলে সবগুলো প্রশ্ন মুখস্থ করে পরীক্ষা দিন।

অনেক সময় আপনি পরীক্ষা দিতে গিয়ে দেখতে পান প্রশ্ন খুবই কঠিন। প্রশ্নের ধরন আপনি বুঝে উঠতে পারছেন না। এদিকে সময় বয়ে যাচ্ছে। ফলে, প্রশ্নটা না লিখেই আপনি বেরিয়ে আসলেন। আর তখনই মনে হলো, আরে! এ প্রশ্নটা তো আমি পারতাম! কিন্তু, প্রশ্নের ধরন সামান্য বদলে যাওয়ায় আপনি লিখতে পারেননি।

আমাদের স্কুলে একবার এমন হয়েছিল। প্রিটেস্ট পরীক্ষায় অংক বই হতে কোন প্রশ্ন করা হয়নি। অংকের নিয়ম অনুসরণ করেই প্রশ্ন করা হয়েছিল। কিন্তু আমাদের বইয়ের অংক না থাকায় ৭০ জন ছাত্রের মাঝে মাত্র তিনজন পাস করেছিল। এর মূল কারণ হলো আমরা কোন কিছুই বুঝে পড়ি না। তাই প্রশ্ন একটু ঘুরিয়ে করলেই জানা উত্তরও আমরা ভুল করে আসি। এ সমস্যা সমাধানের দু'টো পথ আছে।

এক: বুঝে পড়া

পড়া শুরুর আগেই আপনার পরীক্ষা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করুন। কারণ, আপনি যতই ভাল পড়ালেখা করুন না কেন পরীক্ষা দিয়েই আপনার মেধা যাচাই করা হবে। তাই পড়া শুরুর আগেই পরীক্ষার জন্য যথাযথ প্রস্তুতি নিন। সেজন্য নীচের তথ্যগুলো সংগ্রহ করুন–

(১) প্রতিটি পরীক্ষার জন্য কত সময় পাওয়া যাবে।

(২) কত নম্বরের পরীক্ষা হবে আর তাতে পাশ/গ্রেড নম্বর কত।

(৩) পরীক্ষা কোন্ ধরনের (মাসিক, সাপ্তাহিক, বার্ষিক, জাতীয়)।

(৪) কয়টি প্রশ্ন আসবে।

(৫) কয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

(৬) কয়টি প্রশ্নের উত্তর লেখা বাধ্যতামূলক। যেমন–অনেক সময় প্রশ্নে লেখা থাকে ১ ও ২ নং প্রশ্ন সহ মোট ৬টি প্রশ্নের উত্তর দাও। এখানে ১ ও ২ নং প্রশ্ন অর্থাৎ দু'টি প্রশ্নের উত্তর লেখা বাধ্যতামূলক।

(৭) প্রতিটি প্রশ্নের নম্বর কত।

(৮) প্রশ্নপত্র কোন্ ধরনের (লিখিত/মৌখিক/বহুনির্বাচনী)।

(৯) প্রশ্নে কোন তথ্য দেওয়া থাকবে কিনা।

(১০) প্রতিটি প্রশ্নে কতক্ষণ সময় পাওয়া যাবে।

(১১) প্রশ্ন ও উত্তর সংবলিত বই আপনার কাছে আছে কিনা।

(১২) কারা খাতা দেখবেন।

(১৩) কবে, কখন ও কোথায় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

(১৪) প্রশ্ন পড়ে তা থেকে প্রশ্নের ফোকাস নির্ধারণ করা। এজন্য যা করতে হবে তা হলো:

(ক) কোন্ জায়গা থেকে বেশি প্রশ্ন এসেছে তা বের করা।

(খ) মূল বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করা।

(গ) প্রশ্নের গুরুত্বানুযায়ী Rank নির্ধারণ করা।

*** খুব গুরুত্বপূর্ণ (তিনবার বা তার বেশি এসেছে)

* একবার এসেছে

N/A কখনও আসেনি

(ঘ) গুরুত্বানুযায়ী প্রশ্নগুলোকে পড়তে হবে ও মনে রাখতে হবে।

(ঙ) *** গুরুত্বের প্রশ্নগুলো অবশ্যই লিখে অভ্যাস করতে হবে। N/Aগুলো একবার পড়লেই চলবে।

দুই: সিস্টেম করে পড়া।

সিস্টেম করে পড়ার মানে হলো তিনটি ধাপ অনুসরণ করে পড়া:

ধাপ: এক

একটা প্রশ্ন কতরকম ভাবে আসতে পারে তা চিহ্নিত করা

পড়া শুরুর আগেই অনুশীলনী, বিগত বছরের প্রশ্ন, বোর্ডের প্রশ্ন, ক্লাস টেস্ট ইত্যাদি সব ধরনের সোর্স থেকে প্রশ্ন সংগ্রহ করুন। দেখুন, একই প্রশ্নকে কতরকমভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। আমি একটা সহজ উদাহরণ দিচ্ছি। বাংলা সাবজেক্টের ভাষা অধ্যায় হতে নিম্নের প্রশ্নগুলো হতে পারে—

১. ভাষা বলতে কী বোঝ? সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য লিখ।

২. ভাষা কাকে বলে? সাধু ও চলিত ভাষার বৈশিষ্ট্য লিখ।

৩. সাধু থেকে চলিত ও চলিত থেকে সাধু ভাষায় পরিবর্তনের নিয়মগুলো লিখ।
৪. হইতেছে আর হচ্ছে কোন্ ভাষারীতি প্রকাশ করে? তাদের মাঝে পরিবর্তনের নিয়মগুলো লিখ।

আপাতদৃষ্টিতে সহজ মনে হলেও চার নম্বর প্রশ্নটা হয়তো আপনাকে কনফিউযড করে দিতে পারে। তাই ভিন্নধারার প্রশ্ন সম্পর্কে আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে রাখুন। তা হলে, পরীক্ষার হলে দ্রুত ও সহজে আপনি প্রশ্ন বুঝতে পারবেন।

ধাপঃ দুই

কী ধরনের উত্তর চাওয়া হচ্ছে তা চিহ্নিত করুন

প্রশ্ন নানা ধরনের হতে পারে। কোন কোন প্রশ্নে খুবই নির্দিষ্ট ও সংক্ষিপ্ত উত্তর আশা করা হয়। আবার কতগুলো প্রশ্ন দাবি করে বিস্তৃত ব্যাখ্যা। এ ছাড়া অনেক প্রশ্নে যাচাই করা হয় আপনার বুদ্ধিমত্তা। প্রশ্নোত্তর লেখার সময় সব সময় দুটো জিনিসের দিকে লক্ষ রাখবেন।
১. প্রশ্নের নম্বর
২. লেখার সময়

ধরুন, ৫ নম্বরের একটি প্রশ্ন এসেছে, কিন্তু আপনি এ প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবেন অনেক বেশি। কিন্তু সময়ে কুলাবে না। তাই শুধু মেইন পয়েন্টগুলো টাচ করে যাবেন। ধরুন, আপনাকে লিখতে দেয়া হলো পলাশীর যুদ্ধ, নম্বর ৫, সময় ১০ মিনিট। কিন্তু, আপনি যতটুকু জানেন তা লিখতে ২৫ মিনিট লাগবে। তাই, পয়েন্ট করে মূল বিষয়গুলো লিখুন। যেমন–কত সালে, কোন্ স্থানে, কার সাথে, কোন্ প্রেক্ষাপটে এ যুদ্ধ হয়েছিল। যুদ্ধের ভয়াবহতা ও ফলাফল এবং এর প্রভাব। এরকম কয়েকটা পয়েন্টে ভাগ করে লিখলে অনিবার্যভাবেই আপনি অনেক বেশি নম্বর পাবেন। আর সময়ও বাঁচাতে পারবেন। আবার যদি কম

জানা প্রশ্নের নম্বর বেশি হয় তা হলেও যা জানেন তাকেই পয়েন্ট বানিয়ে সে পয়েন্টগুলোর দু'তিন লাইন করে ব্যাখ্যা লিখে আসুন। এরপর খাতার নম্বর দেখে নিজেই অবাক হয়ে যাবেন।

ধাপঃ তিন

বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নে পূর্ণ নম্বর পাবার উপায় বের করতে হবে

এক লিটার পানি যদি আপনি কাউকে ছুঁড়ে মারেন সে তেমন কোন আঘাত পাবে না। একই ব্যাপার ঘটবে, যদি একটি এক লিটারের খালি প্লাস্টিকের বোতল আপনি কাউকে ছুঁড়ে মারেন। কিন্তু, যদি বোতলটা আপনি পানি ভর্তি করে ছুঁড়ে মারেন তা হলে এটাই হয়ে উঠবে একটা ভাল অস্ত্র। একই বই থেকেই ভাল ছাত্র, খারাপ ছাত্র সবাই পড়ে। কিন্তু ভাল পরীক্ষা দিতে হলে আপনার বোতল আর পানি আলাদাভাবে কোন আঘাত করতে পারবে না। অর্থাৎ, উত্তরকে সাজিয়ে পরিবেশন করতে হবে। অধিকাংশ বিষয়ের প্রশ্নোত্তর লেখার তিনটি ধাপ আছে।

১. যে প্রশ্ন করা হয়েছে তার উত্তর লেখা।
২. সেই উত্তরের স্বপক্ষে কিছু উদাহরণ, ছবি বা চার্ট উপস্থাপন।
৩. বইয়ের বাইরের কিছু উদাহরণ বা কোটেশন উপস্থাপন করা।

আপনাকে আগেই বলেছি উত্তর লেখার আগে একটু ভেবে নিন। কীভাবে লিখলে প্রশ্নটা পড়তে ভাল ও যথাযথ হবে তা বুঝতে চেষ্টা করুন। যেমন, পার্থক্য লেখার সময় তিনটি কলামে লিখুন। প্রথম কলামে পার্থক্যের কারণ আর বাকি দু'টোতে পার্থক্য লিখুন। অংক করার সময় অবশ্যই অংকটার মূল অংশ খাতায় তুলতে হবে। পড়ালেখার সময় ছাড়াও আপনাকে অবসর সময়ে আগ্রহের বিষয়ের ম্যাগাজিন, পেপার পড়তে হবে। এখন অনেক পেপারেই অনেক বিষয়ের পড়া দেয়া থাকে। সেখান থেকে কোন প্রয়োজনীয় তথ্য পেলে খাতায় তুলে রাখুন।

H.S.C-তে পড়ার সময় পদার্থবিদ্যার 'আলোর কোয়ান্টাম তত্ত্ব' বুঝতেই পারছিলাম না। বই থেকে মুখস্থ লিখে এভারেজ নম্বর পেলেও মনের ভেতর খচখচ করত। এমনকী সাররাও ঠিকমত বোঝাতে পারেননি। এ সময় একটা দৈনিক পত্রিকার বিজ্ঞান সাময়িকীতে এ বিষয়ের উপর ছবিসহ চমৎকার একটা প্রবন্ধ পড়লাম। এরপর তা নোট করে পরবর্তী পরীক্ষায় লিখলাম। মজার ব্যাপার হলো, আমিই একমাত্র ফুল মার্কস পেলাম। আর সারও আগ্রহী হয়ে জানতে চাইলেন, 'এটা কোথায় পেয়েছ?' তাঁকে পেপারটা যোগাড় করে দিয়েছিলাম। তিনি পরবর্তী লেকচারেই সেই পেপার থেকে পড়ালেন।

তাই এখন আপনাকে ভাল ফলাফল করতে হলে বইয়ের বাইরের কিছু জ্ঞান রাখতে হবে। এখন যেহেতু ইন্টারনেট খুবই সহজলভ্য, তাই যে কোন টপিকের নাম লিখে সার্চ দিলেই কোটি কোটি রিসার্চ পেপার পড়তে পারবেন। তার মাঝে সবচেয়ে বেশি পড়া হয়েছে যেগুলো, তার দু'একটা পড়লেই আপনি অনেক তথ্য পাবেন। এগুলোকে জায়গামত কাজে লাগাতে পারলে বুঝতেই পারছেন, নম্বর আপনার দিন দিন বাড়তেই থাকবে।

লক্ষ্য

আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থী H.S.C. পরীক্ষার পর ঠিক করেন কী করবেন। আরও, মজার ব্যাপার হলো তাঁদের লক্ষ্য হলো সব জায়গায় পরীক্ষা দিয়ে সবচেয়ে ভাল যেটাতে চান্স

পাবেন সেটাতে পড়া। এদেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থী নিজেরা ডিসিশান নেন না। বাসায় বাবা-মার যে সাবজেক্ট পছন্দ তাতে পড়তে হবে। তাই, দেখা যায়, অংকে প্রচুর মেধাবী হয়ে অনেকে পারিবারিক চাপে ভিন্ন বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করেন। তাই, তাঁর মেধা কোন কাজে লাগে না। পড়ার কোন উৎসাহ থাকে না। আবার মাঝে মাঝে হুজুগ ওঠে একটা নির্দিষ্ট সাবজেক্টে পড়ার। যেমন কম্পিউটার সহজলভ্য হবার পর সবাই কম্পিউটার সাইন্সে পড়া শুরু করল। নতুন নতুন প্রাইভেট ভার্সিটি চালু হলো যেখানে শুধু কম্পিউটার সাইন্স পড়ানো হয়। ফলে, কিছুদিন পরই চাকরীর বাজারে দেখা গেল সংকট। আমাদের অর্ধেক কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ ছাত্ররা বর্তমানে প্রাইভেট পড়িয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। এখন যেমন আবার হুজুগ উঠেছে MBA, BBA পড়ার। তাই, সবাই ছুটছে MBA পড়তে।

এই যখন যা আসে তা পড়ব, তাতে ক্যারিয়ার করব, এ মানসিকতার ফলে অনেক ভাল ছাত্রও কাজ করছেন নিম্নশ্রেণীর। তার মাঝে যাঁদের পৈত্রিক সম্পত্তি আছে তাঁরা চলে যাচ্ছেন বিদেশে। ফলে, দেশে যে মাত্র ২০ ভাগ শিক্ষিত মানুষ আছেন, তাঁরা ভুগছেন আর্থসামাজিক নিরাপত্তাহীনতায়। আর এ সবের পেছনে মূ.। কারণ হলো লক্ষ্যহীনতা।

১৯৫২ সালে আমেরিকার ইয়েল ইউনিভার্সিটির সমাপনী ব্যাচের ছাত্রদের কাছে জানতে চাওয়া হয়, তাঁদের লক্ষ্য সম্বন্ধে। তাঁদের প্রত্যেকের লক্ষ্য লিখে রাখা হয়। এতে দেখা যায়, ৯৭ ভাগ ছাত্রই নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য লেখেননি। বাকি ৩ ভাগ ছাত্র আগামী ২৫ বছরে কে কত আয় করবেন, কেমন জীবন-যাপন করবেন তা স্পষ্ট করে লিখে রেখেছিলেন।

১৯৭৭ সালে ইয়েল কর্তৃপক্ষ তাঁদের সেই শিক্ষার্থীদের ঠিকানা বের করে সমীক্ষা চালান এবং দেখতে পান সেই ৩ ভাগ ছাত্রের আয় বাকি ৯৭ ভাগের সম্মিলিত আয়ের চেয়েও তিনগুণ

বেশি।

এ পার্থক্যের কারণ কী? সেই তিন ভাগ শিক্ষার্থী কি অসম্ভব মেধাবী ছিলেন? মোটেই না। তবে, তাঁরা জানতেন তাঁরা কী চান।

টাইগার উডস, বর্তমানে পৃথিবীর ১ নম্বর গলফার। তিনি মাত্র ২৪ বছর বয়সে পৃথিবীর সর্বাধিক টুর্নামেন্ট জেতার লক্ষ্য ভেঙেছেন। তিনি কত বছর বয়সে গলফার হতে চেয়েছেন জানেন? মাত্র ৮ বছর বয়সে। এ সময় তিনি ঠিক করেন, তিনিই হবেন বিশ্বের সেরা গলফার। আর ঠিক তাই হয়েছেন।

স্টিভেন স্পিলবার্গ, মাত্র ১২ বছর বয়সে ঠিক করেছিলেন, তিনি পৃথিবীর সেরা চলচ্চিত্র নির্মাতা হবেন। বর্তমানে তাই হয়েছেন। বিল ক্লিনটন স্কুলে থাকতেই ঠিক করেন, তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হবেন। মজার ব্যাপার হলো, ক্লাসে তাঁর বন্ধুরা তাঁকে সম্বোধন করত প্রেসিডেন্ট বলে। যার সাথেই তাঁর দেখা হত, তিনি তাদের খোঁজখবর নিতেন এবং জানিয়ে দিতেন তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হবেন। যে কোন রাজনৈতিক সেমিনারে তিনি ছোটবেলা থেকেই সক্রিয়ভাবে অংশ নিতেন। ফলে, তিনি সবচেয়ে কম বয়সে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

তা হলে আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন, লক্ষ্য ঠিক করলেই যদি তা হওয়া যায় তা হলে সবাই তা করে না কেন? এর সুনির্দিষ্ট কারণ হলো–

(১) আত্মবিশ্বাসের অভাব

বেশিরভাগ মানুষই লক্ষ্য ঠিক করতে ভয় পান। তাঁরা বিশ্বাস করেন যা হবার তা হবেই। আমার এতে কিছুই করার নেই, সবই আল্লাহর দান।

(২) হতাশা

অনেক ছাত্রই বিশ্বাস করেন লক্ষ্য ঠিক করে লাভ নেই। কারণ, আমি জানি আমি পারব না। আগেও চেষ্টা করেছিলাম। তাঁদের বাজে ফলাফলের কারণ হলো তাঁরা সঠিক পরিকল্পনা ও পদ্ধতিতে পড়েননি। কিন্তু এ কথা তাঁরা মানতে চান না।

(৩) তাঁরা হেরে যেতে ভয় পান

অনেকেই এমন ভাবেন যে, যদি আমি লক্ষ্য ঠিক করি A+ পাব, কিন্তু পেলাম B, তা হলে কী হবে? সবাই হাসাহাসি করবে। তাই, তাঁরা কোন লক্ষ্য ঠিক করেন না।

তা হলে বুঝতেই পারছেন, এখন আপনাকেই ডিসিশান নিতে হবে যে আপনি কি আর দশটা সাধারণ মানুষের মত বেঁচে থাকতে চান, নাকি জীবনে কিছু করে যেতে চান। আমি আপনাকে লক্ষ্য ঠিক করতে সামান্য Help করতে পারি। কিন্তু, নিজের লক্ষ্য ঠিক করতে হবে আপনাকেই।

Think Big

যখনই লক্ষ্য ঠিক করুন না কেন, তাকে করুন আকাশছোঁয়া। ম্যাড়মেড়ে সহজ লক্ষ্য দেবেন না। যদি আপনার লক্ষ্য বাস্তবায়ন করা প্রায় অসম্ভব বলে মনে হয়, তা হলেই সেটা হবে সঠিক লক্ষ্য। কারণ, তখন আপনার ব্রেন একে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেবে। এটাকে সম্ভব করার জন্য আপনি আপনার সর্বশক্তি প্রয়োগ করবেন। এবার তা হলে আপনাকে একটা গল্প বলি–

ধরুন, আপনার একটি ফলের দোকান আছে। এ দোকানের কর্মচারী আপনিসহ মাত্র দু'জন। প্রতিমাসে আপনার

লাভ থাকে ১০ হাজার টাকা। কর্মচারীকে বেতন দেন ৩ হাজার টাকা আর বাকি টাকা থাকে আপনার। এখন যদি আমি আপনাকে লক্ষ্য দিই মাসে ১৫ হাজার টাকা লাভ করতে হবে, আপনি কি তা পারবেন?

আমার বিশ্বাস আপনি পারবেন। আপনি নিজেও এ কথা জানেন। এজন্য আপনাকে অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হবে। দোকানে বিক্রির সময় বাড়াতে হবে। তা হলেই সম্ভব। এবার যদি আমি আপনাকে লক্ষ্য দিই মাসে ৩০ লাখ টাকা লাভ করতে হবে, তা হলে? এবার, আপনি বলছেন, ধুর! পাগল নাকি? ফলের দোকান দিয়ে ৩০ লাখ টাকা মাসে? কিন্তু আমি বিশ্বাস করি আপনি তা পারবেন। আর এজন্য আপনাকে আপনার চিন্তা ও কাজের ধারা বদলাতে হবে। প্রথমে, আপনার দোকানে আরেকজন লোক নিয়োগ দিন। এবার, ফলবাজারের বিভিন্ন দোকানে আপনি নিজে যোগাযোগ গড়ে তুলুন। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন যে, আপনার দোকানেই সবচে টাটকা ফল পাওয়া যায়। পোস্টার ছাপিয়ে বিভিন্ন জায়গায় তা লাগিয়ে দিন। মাসখানেকের মধ্যেই আপনার বিক্রি প্রায় তিনগুণ বেড়ে যাবে। এবার আরেকটা দোকান খুলুন। টিভিতে বিজ্ঞাপন দিন। বিভিন্ন অফিস, হাসপাতাল, অভিজাত আবাসিক এলাকায় সরবরাহের দায়িত্ব নিন। এতে আপনি মাসে ২-৩ লাখ টাকা লাভ করতে পারবেন। এখন দেশের মূল শহরগুলোতে আলাদা আলাদা দোকান করুন। দেশের সব জায়গায় আপনার ফল পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। আপনার ফলের কোয়ালিটির ব্যাপারে কোন আপোষ করবেন না। ঠিক এর পরের মাসেই মাসে ৩০ লাখ টাকা লাভ আপনি ছাড়িয়ে যাবেন। এখন কি বিশ্বাস করছেন, এটা সম্ভব? অতএব, বুঝতেই পারছেন, বিশাল লক্ষ্য

ঠিক করলে আপনার মাথাতেই নতুন আইডিয়া আসবে। আপনি বুঝতে পারবেন, একটা দোকানে বসে থেকে মাসে ৩০ লাখ টাকা আয় সম্ভব না। আপনার কর্মপদ্ধতি বদলাতে হবে। এতক্ষণ যে গাঁজাখুরি গল্প শুনছিলেন তার মত একটা সত্যি ঘটনা শুনুন।

সিম উয়ং হু (Sim Wong Hoo) সিঙ্গাপুরের একজন সাধারণ মানের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু তিনি স্বপ্ন দেখতে ভালবাসতেন। মাত্র ১৫ বছর বয়সে ঠিক করেন; পৃথিবীব্যাপী একটা নতুন প্রযুক্তি বিক্রি করবেন। ১৭ বছর বয়সে তিনি ঠিক করেন, তৎকালীন যে কম্পিউটার ছিল সেটা শুধু কাজই করবে না, সেই সাথে গান শোনাবে, ছবি দেখাবে এমনকী এতে গেমসও খেলা যাবে। কিন্তু তিনি ছিলেন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। আর দশজন ছেলের মত তিনিও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে পাস করে, মাসে ১৫০০ ডলারের চাকরীতে ঢুকতে পারতেন। কিন্তু তিনি তাঁর স্বপ্নকে বিশ্বাস করতেন। মাত্র ৬,০০০ ডলার মূলধন নিয়ে তিনি ১৯৮১ সালে তাঁর প্রতিষ্ঠান Creative Technology শুরু করেন। কিছুদিনের মধ্যে তিনি আবিষ্কার করেন cubic CT, যা ছিল পৃথিবীর প্রথম Multimedia কম্পিউটার। আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন, যা বাবা! এত সহজেই সব হয়ে গেল! মোটেই না। তাঁর এ কম্পিউটার একটাও বিক্রি হয়নি। তাঁর কোম্পানী প্রচুর লোকসান দিল। তিনি নিজে ধার-দেনায় ডুবে গেলেন। কিন্তু, তিনি এটাকে ব্যর্থতা না ধরে নিরলসভাবে পরিশ্রম করেন, আর এ কম্পিউটার বিক্রি না হবার কারণ অনুসন্ধান করেন। তিনি বুঝতে পারেন, মানুষ এখনও এত আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কথা ভাবেনি। এতে কী লাভ হবে, তারা তা

বুঝতে পারছে না। আর এর উচ্চমূল্যও বিক্রি না হবার অন্যতম কারণ। তিনি একের পর এক চেষ্টা চালিয়ে যান। আর একের পর এক ব্যর্থতার মুখোমুখি হন। কিন্তু তিনি স্বপ্ন দেখা ছাড়েননি। তিনি চেষ্টা চালিয়ে গেছেন এর উন্নতিসাধনের। অবশেষে, তিনি স্বল্পমূল্যের সাউন্ডকার্ড উদ্ভাবনে সক্ষম হন। তিনি এর নাম দেন Sound Blaster. এবং এরপরের ঘটনা তো ইতিহাস। তখন, পৃথিবীর সব দেশে, যেখানেই কম্পিউটার ছিল, সেখানে এই সাউন্ডকার্ড ব্যবহৃত হত এবং বর্তমানে পৃথিবীর ৬০ ভাগ PC-তে Sound Blaster ব্যবহৃত হয়। ১৯৯২ সালে, সিঙ্গাপুরের প্রথম কোম্পানী হিসেবে NASDAQ-এ লিস্টেড হয়। বর্তমানে Creative-এর কর্মচারী আছেন ৫০০০ জন এবং এর বার্ষিক লাভ মাত্র ১.৩ বিলিয়ন ডলার!

তাই স্বপ্ন দেখতে ভয় পাবেন না। বিশ্বাস করুন আপনি পারবেন। প্রতিটি ব্যর্থতাকেই শিক্ষা হিসেবে ধরে নিন। আর, নতুনভাবে চিন্তা করা শিখুন। আপনি সফল হবেন। এবার তা হলে জেনে নিন Powerful লক্ষ্য তৈরির ধাপগুলো–

(১) আপনার নোটবুকে নির্দিষ্ট করে লিখুন আপনি ঠিক কী চান

আমি ইংরেজীতে ভাল নম্বর পাব, এটা কোন লক্ষ্য নয়। লিখুন, আমি ইংরেজীতে ৮৫ নম্বর পাব। যদি আপনি ৬০% নম্বরের লক্ষ্য ঠিক করেন তা হলে আপনার ব্রেন আপনার অজান্তেই ৪০ ভাগ পড়া বাদ দিয়ে যাবে। ফলে, ৬০ ভাগের জ্ঞান নিয়ে পরীক্ষা দিতে গেলে আপনি ৪০-৫০ নম্বর পাবেন। তাই উচ্চমাত্রার লক্ষ্য নির্দিষ্ট করুন। কারণ, ব্রেন তা হলে এটাকে

চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেবে।

(২) আপনার লক্ষ্য বাস্তবায়িত হলে কী কী লাভ হবে তা লিখুন

অনেকেই জানেন না, পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করলে কী লাভ হবে। তাই আপনি লিখে ফেলুন বেশি নম্বর পাওয়ায় আপনার জীবন কেমন বদলে যাবে। যেমন, ধরুন, অংকে ১০০ পেলে ক্লাসের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটা আপনাকে অবাক চোখে দেখবে। হা-হা। এমন যত লাভ হবে তা লিখে ফেলুন।

(৩) একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা আর তা বাস্তবায়নের উপায় লিখুন

আপনার লক্ষ্যে পৌঁছাতে কী কী ব্যবস্থা নেবেন তা ডিটেলসে লিখুন।

(৪) একটা ডেডলাইন নির্দিষ্ট করুন

আপনাকে অবশ্যই ডেডলাইন নির্দিষ্ট করতে হবে। এ পড়া এ সপ্তাহেই শেষ করতে হবে এমন ডেডলাইন দিন। কত তারিখে আপনি লক্ষ্যে পৌঁছবেন তা নির্দিষ্ট করুন।

(৫) আপনার ইমোশনকে উদ্দীপ্ত করুন

মানুষ যত যুক্তির কথাই বলুক সে চলে সম্পূর্ণ আবেগে। তাই, নিজের আবেগ, ইন্দ্রিয়ানুভূতি সব কিছুকেই নিয়োজিত করুন লক্ষ্য অর্জনে। প্রতিদিন কিছু সময়ের জন্য দিবাস্বপ্ন দেখুন। কল্পনা করুন লক্ষ্য পূরণের আনন্দ। ভাবুন, সবাই আপনাকে Congratulate করছে।

(৬) এখনই এক পৃষ্ঠা হলেও পড়া আরম্ভ করুন

এটা একটা জরুরী বিষয়। এখন সময় যাই হোক, রাত ১টা বা

ভোর ৫টা, এখনই একটা পাঠ্যবই খুলে দু'পৃষ্ঠা পড়ে ফেলুন। এই প্রথম স্টেপ আপনাকে সারাজীবন উৎসাহ দেবে। তাই দ্রুত দু'পৃষ্ঠা পড়ে আবার বইয়ে চলে আসুন। এবার আসুন লক্ষ্য ঠিক করি। আপনার জীবনের ৪টি ক্ষেত্রের লক্ষ্য ঠিক করলেই মোটামুটি সবটুকু লক্ষ্য ঠিক হয়ে যায়। আর সেগুলো হলো–

(১) পড়ালেখা ও ক্যারিয়ার
(২) স্বাস্থ্য ও খেলাধুলা
(৩) অর্থ ও লাইফস্টাইল
(৪) পরিবার আর সমাজজীবন।

আমি দু'টো উদাহরণ দিচ্ছি। আপনি নিজে লক্ষ্য তৈরি করুন এবং স্টেপগুলো ঠিকমত লিখুন।

উদাহরণ-১–পড়ালেখার লক্ষ্য
লক্ষ্য: ফাইনাল পরীক্ষায় আমি অংকে ৯০% নম্বর পাব।

লাভ ও কারণ:
(১) আমি ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই, তাই অংক ভাল জানা প্রয়োজন।
(২) আমি আমার বন্ধুদের দেখিয়ে দিতে চাই যে, আমিও পারি।
(৩) বাসার সবাই আমার এ সাফল্যে আনন্দিত হবে।

পরিকল্পনা আর বাস্তবায়ন
(১) প্রতিদিন রাতে ১ ঘণ্টা করে অংক করব।
(২) গত তিন বছরের প্রশ্নের উপর পরীক্ষা দেব ও তাতে ৯০ নম্বর পাব।
(৩) প্রতি সপ্তাহে একবার রিভিশন দেব।

বাস্তবায়নের দিন
২৬ নভেম্বর, '০৭

স্বাস্থ্য
লক্ষ্য: আমি এ বছর ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দৌড়ে প্রথম হব।

লাভ ও কারণ
(১) আমি অলরাউন্ডার হতে চাই।
(২) আমি সর্বদা প্রাণশক্তিতে ভরপুর থাকতে চাই।
(৩) আমি প্রমাণ করতে চাই যে আমি পারি।

পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন
(১) প্রতিদিন সকালে ২০ বার বুক ডন দেব ও উঠবস করব।
(২) প্রতি বৃহস্পতিরার বিকেলে দু'ঘণ্টা দৌড়াব।

বাস্তবায়নের দিন
২০ জানুয়ারি, '০৮
আপনি আপনার নোট বইয়ে ডিটেলস লিখবেন আর টেবিলের সামনের দেয়ালে বা টেবিলে লিখে লাগিয়ে দিন শুধু লক্ষ্যগুলো। যেমন–

ফাইনাল পরীক্ষা ২০০৭

ইংরেজী	৮৫
বাংলা	৮৫
পদার্থ	৯০
রসায়ন	৯০
সমাজ	৮৫
ধর্ম	৯০
অংক	১০০
ফলাফল	A+

এবার আপনার জীবনের একটা পোস্টার বানিয়ে দেয়ালে লাগিয়ে ফেলুন। আমি একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

বয়স –১৫–১৬
– S.S.C-তে ৮৫% নম্বর
–নটরডেম কলেজে ভর্তি

বয়স ১৭–১৯
-H.S.C তে ৮০% নম্বর
–ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি

বয়স ২০–২৫
M.B.B.S ডিগ্রি লাভ
–একটি বই লেখা

বয়স ২৫–৩০
–পোস্ট গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি লাভ
–মাসে ৫০ হাজার টাকা আয়

বয়স ৩০–৩৫
–মাসে ৩ লক্ষ টাকা আয়
–একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন
–গাড়ি (মার্সিডিস)
–বিয়ে (বুদ্ধিমান ও দায়িত্বশীল স্ত্রী)

বয়স ৩৫–৪০
–একটি হাসপাতাল তৈরি
–ধনী ও দরিদ্র উভয়কে সেবা প্রদান
–বাড়ি (৬ বেডরুম, Music Room, বিশাল লাইব্রেরি)

বয়স ৪০–৪৫
–দেশের সর্বত্র ক্যাম্পের মাধ্যমে চিকিৎসাসেবা পৌঁছানো
–স্বল্পমূল্যে উন্নতমানের চিকিৎসা সেবা প্রদান

বয়স ৪৫–৫০
–দেশের প্রত্যেক ঘরে ঘরে চিকিৎসা সেবা পৌঁছানো
–উন্নতমান নিশ্চিত করা

বয়স ৫০+
–দেশের দারিদ্রমুক্তির জন্য কাজ করা
–আত্মজীবনী ও উপন্যাস লেখা

[প্রতি বছর একবার বিদেশে ও প্রতি দু'মাসে একবার দেশের বিভিন্ন জায়গায় বেড়ানো]

বিখ্যাত ক্যারিয়ার প্ল্যানার স্টুয়ার্ট ট্যান বলেছেন, লক্ষ্য ঠিক করে একটা প্রাথমিক প্রস্তুতি নিতে হবে। ধরুন, আপনি একটি গাড়ি কিনতে চান। তাই, প্রাথমিক স্টেপ হলো গাড়ির শো রুমে ঘুরে আসা। যদি তা না পারেন অন্তত একটা খেলনা গাড়ি টেবিলে সাজিয়ে রাখুন। পড়ালেখার ক্ষেত্রে আপনি যে প্রতিষ্ঠানে পড়তে চান, সেখানে সশরীরে উপস্থিত হোন। নিজেকে এর অংশ বলে মনে করুন। মনে করুন আপনি এখানে ক্লাস করছেন। আপনার এই স্টেপ আপনার পড়ালেখার ক্ষেত্রে বিশাল মানসিক আবেদন সৃষ্টি করবে। আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজে চান্স পাবার আগে বেশ কয়েকবার সেখানে গিয়েছি। নিজেকে এর অংশ হিসেবে কল্পনা করেছি। পড়তে বসার আগে চোখ বন্ধ করে নিজেকে সেখানে কল্পনা করেছি। আপনি যদি বিদেশে কোন ভার্সিটিতে পড়তে চান, তা হলে সেখানকার ছবি ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করুন। নিজেকে সেখানে কল্পনা করুন। এর ফলে আপনার আগ্রহ আর উদ্দীপনা অনেক বেড়ে যাবে। পড়া তৈরি করা অনেক আকর্ষণীয় মনে হবে। একবার চেষ্টা করেই দেখুন না।

মোটিভেশন

এ পৃথিবীতে প্রত্যেক কাজ সম্পন্ন হবার পেছনেই মোটিভ থাকে। কখনও ইচ্ছায়, কখনও অনিচ্ছায় নানা ধরনের কাজ আপনি করে থাকেন। কিন্তু আর দশজনের মত আপনিও তা নিয়ে খুব একটা চিন্তা করেন না। পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজব্যবস্থায় ভাল কাজ, মন্দ

কাজ চিহ্নিত করা হয়েছে। ধর্মগ্রন্থগুলোতে বলা হয়েছে ভাল কাজ করলে স্বর্গ আর মন্দ কাজে নরক লাভ হবে। আমি বা আপনি যে কোন কাজ করলেই মনের মাঝে একটা বোধ কাজ করে। এটা কী ভাল কাজ, না মন্দ কাজ! আমরা আনন্দ বা ঘৃণা নিয়েও কিছু কাজ করে থাকি। কিন্তু আমরা এগুলো সম্বন্ধে ততটা সচেতন নই। তাই এ চ্যাপ্টারে আমরা শিখব কীভাবে কোন কাজ সচেতনভাবে করা যায়, এসব মোটিভের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে। আপনি একটু ভেবে দেখুন তো, জীবনে ঠিক কতগুলো ভাল কাজ আপনি শুরু করেই ১ দিন বা ১ ঘণ্টা পরেই ছেড়ে দিয়েছেন? আমি নিজের কথাই বলি। আমার আছে অনেকগুলো নেশা। না, ড্রাগসের নেশা নয়। গল্পের বই পড়া, গান শোনা, টিভি দেখা, গেমস খেলা ইত্যাদি। আমি পড়ালেখা বাদে যা কিছুই করতে যাই তা নেশার মত কাজ করে। ধরুন, কোন লেখকের একটা বই পড়ে ভাল লাগল। তারপর, আমি তাঁর লেখা সব বই যেখান থেকে, যেভাবে পারি যোগাড় করে পড়তে থাকি। এভাবে, ধুমধাম কিছুদিন পার হয়ে যায়। পরীক্ষার দু'মাস বাকি। কালকে পড়া শুরু করব। আজকে টিভি দেখে নিই। এভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হয়ে যায়। পড়া শুরু করার কথা ৭টায়। কিন্তু ৬টার সময় ইচ্ছে হলো গান শোনার। কিছুক্ষণ রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনলাম। ধুর: ভাল লাগছে না। Linkin Park শুনি। এভাবে ১০টা বেজে গেল। থাক! কালকে থেকে পড়ব। আমি নিজেও বুঝতাম না প্রতিদিন পড়তে বসলেই কেন এত ঝামেলা শুরু হয়! বইটা খুললেই মন চলে যায় টিভির গানে, কারও চেহারা, কথোপকথনে। ফলে পড়া জমতে থাকে, আর বাড়তে থাকে। পরীক্ষা আসলে চোখে অন্ধকার দেখি। ওরে বাবা! এত পড়া বাকি! এ টার্মটা কোনমতে কাটিয়ে দিই। Next টার্মে ভালভাবে পড়ব। নেক্সট টার্মও শেষ হয়ে যায়। এবার ভাবি, আগামী বছর এমন পড়া দেব! এভাবে, নিজেকে কিছুটা বোঝাতে পারলেও,

শিক্ষক আর বাবা-মাদের বোঝানো যায় না। কারণ, নম্বরটা দিন-দিন কমতে থাকে।

এখন তা হলে জেনে নিন এর কারণ কী? মানুষকে ছোটবেলা থেকেই শেখানো হয়, যে কাজে আনন্দ সেটা করতে, আর যেটা ক্ষতিকর, সেটা বর্জন করতে। ছোটবেলায় জিনিসগুলো সহজ থাকে। এত কঠিন পরিস্থিতি, আর পড়া বোঝার সমস্যা থাকে না। কিন্তু ছোটবেলার সে অভ্যাসটা থেকে যায়। তাই টিভি দেখে, বই পড়ে আমরা আনন্দ পাই দেখে তা করতেই থাকি। কিন্তু আমাদের এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা তৈরি করতে হবে যে, সারাজীবন টিভি দেখে কাটানো যাবে না। বড় হলেই কাজ করে খেতে হবে। আর তার জন্য পড়ালেখা অত্যাবশ্যক। আমাদের অধিকাংশেরই যেহেতু ধারণাও নেই তাঁরা আগামী বছর কী করবেন, তাই তাঁরা সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে সময় নষ্ট করতে ভয় পান না। ফলাফল, দেশ ভর্তি বেকার। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন। সীমাহীন দুর্নীতি। কিন্তু, আপনি যেহেতু এ বইটা পড়ছেন, তাই আপনি আর দশটা সাধারণ মানুষের মত নন। তা হলে চলুন, করে ফেলুন অনুশীলনীগুলো–

অনুশীলনী–১

ক. আপনি যদি ঠিকমত পড়ালেখা না করেন, তা হলে কী কী ক্ষতি হবে তা লিখুন। যেমন–পরীক্ষায় কম নম্বর পাবেন, বন্ধুরা হাসাহাসি করবে, বাবা-মা কষ্ট পাবেন। আপনি ঠিক যতগুলো পয়েন্ট লিখতে পারবেন লিখুন। এবার লেখা শেষ হলে সেটা তিনবার পড়ুন। এবার চোখ বন্ধ করে তিন মিনিট মনে মনে পয়েন্টগুলোকে চিন্তা করুন।

মনে করুন, আপনি খুব কম নম্বর পেয়েছেন, আপনার বন্ধুরা প্রচুর নম্বর পেয়েছে। সবাই আপনাকে করুণা করছে। আপনার বাবা-মা লজ্জায় মাথা নিচু করে বসে আছেন। তিন মিনিট পর

আবার খাতা নিয়ে বসুন।

খ. এবার লিখুন, এরকম ভাবে পড়ালেখায় ফাঁকি দিলে ১০ বছর পর আপনার কী অবস্থা হবে? যেমন–আপনি কোন ভাল কলেজ বা ভার্সিটিতে ভর্তি হতে পারেননি। আপনি কোন চাকরি পাচ্ছেন না। ঘরে বাইরে সর্বত্রই আপনাকে অপমান করা হচ্ছে।

এবার, তিন মিনিট চোখ বন্ধ করে নিজেকে সে অবস্থায় কল্পনা করুন। দুঃখটাকে অনুভব করুন।

গ. এবার লিখুন, ঠিকমত পড়ালেখা করলে কী লাভ হবে? লিখুন, A+ পেলে আপনার কী কী লাভ হবে। যেমন–ভীষণ আনন্দ পাচ্ছেন, সবাই বাহবা দিচ্ছে, বাবা-মা খুব খুশি।

এবার, তিন মিনিট কল্পনা করুন।

ঘ. এবার লিখুন, ১০ বছর পর কেমন অবস্থা হবে। আপনি দেশের সেরা কলেজ বা ভার্সিটির ডিগ্রি পাচ্ছেন। খুব বড় কোন চাকরি বা ব্যবসা করছেন। আপনার অনেক সম্মান ও টাকা হয়েছে।

এবার, তিন মিনিট কল্পনা করুন। আনন্দটাকে অনুভব করুন। এখন এই পয়েন্টগুলো লিখে ঘরের দেয়ালে লাগিয়ে রাখুন। প্রতিদিন পড়তে বসার আগে, পড়ালেখা না করলে আর করলে কী হবে তা দেখে নিন। তা হলে, পড়তে বসলে অনেক উৎসাহ পাবেন।

এবার জেনে নিন, সফল হবার সর্বাধুনিক কৌশল। বিদেশে বিভিন্ন কোম্পানী তাদের প্রচারের জন্য এ কৌশল ব্যবহার করে। সম্প্রতি আমাদের দেশের একটি মোবাইল কোম্পানীও এ কৌশল অবলম্বন করে সফলতা পেয়েছে। এতে চারটি ধাপ আছে।

প্রথম ধাপ: নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করুন

সাফল্যের মূল শক্তি হলো আত্মবিশ্বাস। নিজেকে বিশ্বাস

করুন। নিজের সাথে ওয়াদা করুন, আপনি সব বিষয়ে A+ পাবেন। এর জন্য আপনার যা কিছু করা প্রয়োজন, তাই করবেন। যদি টিভি দেখা, আড্ডা দেয়া ছাড়তে হয়, তাই করবেন। আপনার লক্ষ্য থাকবে নির্দিষ্ট এবং আপনি তা পূরণ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

দ্বিতীয় ধাপ: সবাইকে জানিয়ে দিন আপনি কী করবেন

এতে লজ্জার কিছু নেই। ব্যর্থতাকে ভয় পাবেন না। কারণ, আপনি জানেন আপনি ব্যর্থ নন। হয়তো আপনার কৌশলে ভুল ছিল। তাই লক্ষ্য স্থির করে বন্ধুবান্ধব, বাবা-মাকে জানিয়ে দিন। এতে যদি কেউ হাসাহাসি করে, তা হলে তাকে চ্যালেঞ্জ করুন। যত বেশি লোক হাসাহাসি করবে, ততই তা আপনার আত্মবিশ্বাসকে বাড়িয়ে দেবে। আপনার ভেতর একটা অন্ধ আবেগ ও জিদ কাজ করবে, কিছু একটা করে দেখানোর। এ প্রেরণাই আপনাকে সফল হতে সাহায্য করবে।

তৃতীয় ধাপ: কাজের মূল্যায়ন করুন

প্রতি সপ্তাহে একটি দিন নির্দিষ্ট করুন। সেদিন পুরো সপ্তাহের কাজকে বিশ্লেষণ করুন। আপনি কত ঘণ্টা পড়েছেন, কয়টা Mind Map বানিয়েছেন, পড়ার জন্য আপনার প্রিয় নাটক দেখেননি ইত্যাদি। আর যদি ফাঁকি দিয়ে থাকেন তা হলে তার কারণগুলোও লিখুন এবং পরবর্তী সপ্তাহে তা না করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোন।

চতুর্থ ধাপ: নিজেকে পুরস্কার দিন

প্রতি সপ্তাহে কাজের মূল্যায়ন শেষে নিজেকে পুরস্কার দিন। ধরুন, সপ্তাহে ৩০ ঘণ্টা পড়ার কথা ছিল এবং আপনি তা পড়েছেন। মূল্যায়নের দিন তা হলে একটি গল্পের বই

পড়ে ফেলুন বা আড্ডা দিন বা একটা সিনেমা দেখুন। এটাই পুরস্কার।

এ পদ্ধতির সফল ব্যবহারের উদাহরণ সৃষ্টি করেছে বাংলা লিংক। বাংলালিংক-এ চারটি ধাপ কীভাবে ব্যবহার করেছে তা দেখুন।

প্রথম ধাপঃ তারা নিজেদের প্রতি কমিটমেন্ট করেছে ১ বছরে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক পৌঁছে দেবে। যেখানে অন্য কোম্পানীগুলোর সময় লেগেছে ৮-১০ বছর, সেখানে তাদের লক্ষ্য ছিল অনেকটাই আকাশছোঁয়া ও অসাধারণ।

দ্বিতীয় ধাপঃ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে তারা সারাদেশের মানুষকে জানিয়ে দিয়েছে ১ বছরের মাঝেই সমগ্র বাংলাদেশ তাদের নেটওয়ার্কের আওতায় আসবে।

তৃতীয় ধাপঃ প্রতি মাসেই তারা পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছে এ মাসে কয়টা জেলা আর কয়টা থানায় তাদের নেটওয়ার্ক পৌঁছে গেছে।

চতুর্থ ধাপঃ তারা তাদের প্রতিজ্ঞা সময়ের আগেই পূর্ণ করে সেলিব্রেট করেছিল।

তাই বাংলা লিংকের এ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আপনিও নতুন উদ্যমে পড়া শুরু করুন।

বন্যেরা বনে সুন্দর

আধুনিক নিয়মের সাথে আপনি যদি আপনার স্বকীয়তা জুড়ে দিতে পারেন তা হলে অনন্য ব্যাপার হয়। আমি ভাগ্যবান কারণ আমার চেয়ে অনেক মেধাবী ছাত্রের সাথে পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তাঁদের পড়ার স্টাইল আমি কাছ থেকে লক্ষ করেছি। তাঁদের পড়ার পদ্ধতির কিছু মজার দিক আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি। আপনার পছন্দমত স্টাইল আপনি অনুসরণ করতে পারেন।

প্রথমে জানাচ্ছি আমার কলেজের বন্ধু অনির্বাণের কথা। সে খুবই ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র। তবে তার পড়ার থিওরী হলো ঝাড়া মুখস্থ। তার যুক্তি হলো, না বুঝে মুখস্থ করলেও পড়া মনে থাকলে এক সময় তা বোঝা হয়ে যায়। ধরুন, ফিজিক্সের একটা প্রশ্ন তার বুঝতে সমস্যা হচ্ছে, সে প্রথমে লাইন বাই লাইন মুখস্থ করে ফেলল। পরে আরও অনেকের সাথে ডিসকাস করে সে পড়া বুঝে ফেলে। এ পদ্ধতিতে পড়ার সুবিধা হলো অনেক বেশি নম্বর পাওয়া যায়।

আসাদ ব্যুয়েটে পড়ত। সেও আমার কলেজের বন্ধু। তার পড়ার ধরন ছিল সব বিষয়ের সবগুলো টপিক পড়ত, সেগুলো লিখত। তারপর পরীক্ষা দিত। কোন কিছু বাদ দিয়ে গেলে তার টেনশন হয়। তাই, আমাদের খেপানো সত্ত্বেও সে পড়া বাদ দিত না।

শান্ত আমার মেডিকেলের বন্ধু। তার সমস্যা হলো না পড়ে সে থাকতে পারে না। ১০ দিন ছুটি পেলে দু'দিন খুব কষ্ট করে ছুটি কাটায়। তারপর পড়া শুরু করলেই তার মন ভাল হয়ে যায়। তার পড়ার ধরন আরও অদ্ভুত। সে খাটের মাঝখানে বসে আর তার চারদিকে বই, খাতা, কলম, ডিকশনারী ছড়ানো

থাকে। পড়ার সাথে সাথে সে খাতায় লিখতে থাকে। না লিখে পড়লে কোন পড়াই সম্পূর্ণ হয় না। তাই সে পড়ে আর লেখে। সেই সাথে খাতায় দুর্বোধ্য কিছু ছবি আঁকে।

দীপঙ্কর আরেকজন প্রতিভাবান ছাত্র। তার সম্পদ হলো মেমোরী। পড়া শুরুর দু'ঘণ্টা আগে থেকেই সে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেয়। তার ধারণা, খাবার খেলে সব রক্ত পেটে চলে যায়। এজন্য মাথায় পড়া ঢোকে না। সে খুবই নিয়মিত পড়ে আর অনেক সময় নিয়ে পড়ে। তার বিখ্যাত ডায়লগ হলো, 'এইটা একবার পড়ছি, ঠিকমত পড়ছি, আর ভুলব না।' আমি রিভিশন দেবার যে আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ডের কথা বলেছি সেটা তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আমি আর শান্ত বই বের করে তাকে দু'বছর আগের পড়া ধরেছি আর সে একের পর এক নির্ভুল উত্তর দিয়ে গেছে।

সোহেল আমার একজন পরিশ্রমী বন্ধু। সে HSC-তে ১২তম স্ট্যান্ড করেছিল। তার প্রতিটি কাজই হয় খুব গোছানো। যে কোন পড়া পড়তে গেলে সে কমপক্ষে দু'তিনটা বই নিয়ে পড়ে। বইগুলোর প্রয়োজনীয় অংশ নিয়ে সে নোট তৈরি করে। মেডিকেলের এত সাবজেক্টের এত পড়া থাকা সত্ত্বেও প্রতিটি বিষয়ের আলাদা আলাদা নোট সে তৈরি করেছে। পরীক্ষার আগে তাকে বই দেখতে হয় না। তার পরীক্ষার খাতা এত চমৎকার হয় যে, মনে হয় বাসা থেকে নোট করে এনেছে।

আর সব শেষে যার কথা বলছি সে হলো জামিল। একজন সত্যিকারের জিনিয়াস। সে খুবই ভাল ছবি আঁকে। সে একজন দারুণ ফটোগ্রাফার। মাঝে মাঝে পত্রিকায় লেখালেখি করে। তার ইংরেজী হাতের লেখা আর উচ্চারণ ইংল্যান্ডের ক্লাসিক

ঘরানার। সে ভাল গিটার বাজায়। এ ছাড়া সে একজন দক্ষ সংগঠক। এরপর যদি ভাবেন, পড়ালেখায় ভাল না, তা হলে বিশাল ভুল করবেন। কারণ, পড়ালেখাতেও সে আমাদের চেয়ে কয়েক ধাপ উপরে। নানা ধরনের কাজের চাপ মাথায় নিয়েও সে পড়তে বসে যায় সময় পেলেই। কোন কিছুতেই তার মনোযোগের সমস্যা হয় না। তার ভাল জানার আরেকটি কারণ হলো প্রতিদিনই ক্লাসে সারকে প্রশ্ন করা। এ জন্য তাকে নানা বিদ্রূপ সইতে হয়েছে। ধরুন, ক্লাস শেষ। দু'টো বাজে। সবাই বের হতে চাইছে। সার জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের কারও কোন প্রশ্ন আছে?' জামিল ক্লাসে থাকলে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, সে হাত তুলবেই। আর এমন কোন প্রশ্ন করবে, যা বোঝাতে সারের আরও ১০-১৫ মিনিট সময় লাগবে। সবাইকে ক্লাসে বসিয়ে রাখা সে ভীষণ উপভোগ করত। সেই সাথে সারদের কাছে তার ইম্প্রেশনও ভাল হত। আর পড়াও হয়ে যেত। কারণ, আপনি যে প্রশ্ন করবেন, ক্লাসের অন্য সবাই তার উত্তর না শুনলেও আপনি তা মন দিয়ে শুনবেন।

এখান থেকে আপনি কোন ভাল দিক বেছে নিতে পারেন। এখন তবে চলুন Next অধ্যায়ে।

A+ লাভের সিক্রেট ফরমুলা

আমি বিশ্বাস করি প্রতিটি সফলতার পেছনেই আছে কিছু ফর্মুলা। সেটাকে সচেতন বা অবচেতনভাবে ব্যবহার করেই মানুষ সাফল্য লাভ করে। আপনি হয়তো দেখবেন কিছু ছাত্র আছেন, যাঁরা কখনোই খুব বেশি পড়ালেখা করেন না, কিন্তু পরীক্ষায় অনেক বেশি নম্বর পান। অন্যদিকে কেউ কেউ প্রচুর পড়েও B বা C গ্রেড নম্বর পান। এর কারণ কী? এ অধ্যায়ে আপনাকে আমি জানাব কী কী নিয়ম অনুসরণ করে পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাওয়া যায়।

ফরমুলা-১

লেগে থাকুন

যে সব ছাত্র A+ পান তাঁরা বছরের সব সময়ই পড়ালেখার উপর থাকেন। এমনকী নভেম্বর মাসে ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হলে ডিসেম্বরেই তাঁরা নতুন বই কিনে পড়া শুরু করে দেন। প্রতিদিন যদি গড়ে ৫ ঘণ্টা পড়া হয় তা হলে একজন ভাল ছাত্র ৩ মাসের টার্মে পড়ছেন ৪৫০ ঘণ্টা। এদিকে খুবই প্রতিভাবান একজন ছাত্র যদি পরীক্ষার ১৫ দিন আগে পড়া শুরু করেন এবং দিনে ১০ ঘণ্টা করে পড়লেও মোট সময় পাচ্ছেন ১৫০ ঘণ্টা। এদিকে প্রথমজন দ্বিতীয়জনের চেয়ে যেসব সুবিধা বেশি পাচ্ছেন তা দেখুন–

১. তিনগুণ বেশি সময় পাচ্ছেন।

২. প্রতিটি টপিক বেশ কয়েকবার রিভিশন দেবার সুযোগ পাচ্ছেন।

৩. নোট বানাতে ও পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে পারছেন।

৪. চাপমুক্ত অবস্থায় পড়ার ফলে পড়ার কোয়ালিটিও হচ্ছে অনেক ভাল।

অন্যদিকে, দ্বিতীয়জন দিনরাত পড়ে যা পাচ্ছেন তা হলো–

১. প্রচুর মানসিক চাপ ও হতাশা।

২. যা পড়ছেন তা দ্রুত ভুলে যাচ্ছেন।

৩. পরীক্ষা দেবার পরও সে বিষয়ের উপর কোন দখল থাকছে না। এটা অনেকটা সেই খরগোশ আর কচ্ছপের দৌড়ের গল্পের মত। এটা এমন যে, দু'জনকে দু'ঘণ্টায় ১০ মাইল দৌড়তে বলা হলো। তাঁদের একজন যদি ১ ঘণ্টা ৫০ মিনিটের সময় দৌড়ানো শুরু করেন, তা হলে তিনি কার্ল লুইস হলেও লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেন না।

তবে, এ লেগে থাকাটা খুবই কঠিন বিষয়। এজন্য আপনাকে কিছু টিপস জানিয়ে দিচ্ছি।

১. টিচারের আগে পড়া শেষ করুন

পৃথিবীর ৮০ ভাগ ছাত্রই ক্লাসে পড়া বুঝতে পারেন না। এটাই স্বাভাবিক। একটা নতুন জিনিস বুঝতে সময় লাগে। তাই আপনার কাজ হলো আগামী দিন কী পড়ানো হবে তা আগেই জেনে নিন অথবা সিলেবাস বের করে পড়ে ফেলুন। সবচেয়ে

ভাল হয় Mind Map তৈরি করলে। এ বইয়ের নিয়মগুলো অনুসরণ করে একবার পড়ে তারপর ক্লাসে আসুন। তা হলে দেখবেন, সবচেয়ে কঠিন বিষয়গুলো আপনি কত সহজে বুঝতে পারছেন। যেখানে আপনার বন্ধুরা ক্লাস শেষে ৩০% পড়া বুঝতে পারছেন, মনে রাখতে পারছেন মাত্র ১০%, সেখানে আপনার বোঝা আর মনে রাখার হার হবে ১০০%।

২. ক্লাসে মনোযোগী হোন আর প্রশ্ন করুন

আপনি হয়তো জানতে চাইছেন, যদি আগেই আমার পড়া হয়ে যায়, তা হলে ক্লাস করার কী দরকার! ও আচ্ছা। ঠিক আছে। বলছি। এর উত্তর হলো, একজন শিক্ষকের কাজ আপনাকে পড়ানো নয়। তাঁর কাজ হলো, যে পড়া আপনি বোঝেন না, তা বোঝানো আর পড়ায় সাহায্য করা। আপনি যদি আগেই পড়ে আসেন, তা হলে যে টপিকগুলো বুঝতে সমস্যা হচ্ছে, তা টিচারকে জিজ্ঞেস করুন। আর যখনই কোন কিছু বুঝতে সমস্যা হবে, প্রশ্ন করুন। আপনার বন্ধুরা আপনার আঁতলামি দেখে হাসাহাসি করলেও পাত্তা দেবেন না। কারণ, তারাই পরে আপনার কাছে পড়া বুঝতে আসবে।

৩. দ্রুত রিভিশন দিন

ক্লাস থেকে বাসায় আসার সময় রাস্তায় বা গাড়িতে যেটুকু সময় পান পড়াটাকে রিভিশন দিন। যদি তা না পারেন তা হলে বাসায় এসে ড্রেস চেঞ্জের আগেই একবার পড়ে ফেলুন। তারপর দিনের পড়া শেষে রাতে ঘুমাবার আগে আরেকবার দেখুন। ব্যস। এটাই আপনার ৮০ ভাগ পড়া মনে রাখার কাজ করবে।

৪. ভুলগুলোকে হাইলাইট করুন

আপনার ক্লাস টেস্ট বা হোমওয়র্ক বা পরীক্ষায় যখনই কোন ভুল

করছেন সেটা একটা খাতায় তারিখ, সময় দিয়ে তুলে রাখুন। এ খাতার নাম দিন ভুল খাতা। প্রতিটি সাবজেক্টের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক পৃষ্ঠা বরাদ্দ করুন। পরীক্ষার আগে ভুল খাতা অবশ্যই দেখে নিন। খেয়াল রাখবেন যেন এ ভুল আর না করেন।

ফরমুলা–২

ভুল থেকে দ্রুত শিক্ষা নিন

ঠেকে শেখাই সবচেয়ে বড় শেখা। তাই যখনই কোন ভুল করছেন লক্ষ্য রাখুন যেন তা রিপিট না হয়। ভুল করলে লজ্জার কিছু নেই। কারণ, একজন ভাল ছাত্র অবশ্যই খারাপ ছাত্রের চেয়ে অনেক বেশি ভুল করবেন। তবে ভাল ছাত্র সে ভুল করবেন মূল পরীক্ষার আগে। যেমন–হোমওয়র্কের খাতায়, ক্লাস টেস্ট বা বাসায় প্র্যাকটিসের সময়। এ ভুলের থেকে শিক্ষা নিয়ে তিনি মূল পরীক্ষায় আর ভুল করেন না। এদিকে খারাপ ছাত্ররা তাঁদের ভুলগুলো সংশোধনের কোন সুযোগ পান না। তাই, তাঁদের সব ভুল থাকে পরীক্ষার খাতায়। Mistakes are the Best teachers. আপনি দেখবেন এ বইয়ে পড়বার নানা পদ্ধতি দেয়া আছে। আপনার নিজেরও স্বাধীনতা আছে নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করার। এর মাঝে যে পদ্ধতিতে ভুল বেশি হচ্ছে তা বর্জন করুন। অন্যভাবে পড়ুন। কিন্তু, প্লীজ, হাল ছাড়বেন না।

ফরমুলা–৩

ভুলের কারণ বের করুন

অনেক ছাত্রই ছোট ছোট ক্লাস টেস্ট দিতে তেমন উৎসাহ পান না। অন্যেরটা দেখে লেখা যায় তাই অত সিরিয়াসলি পড়েন না। কিন্তু আপনি এমন ভুল করবেন না। প্রতিটা ক্লাস টেস্ট বা সারের বাসায় পরীক্ষায় আপনার সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রয়োগ করুন। এগুলোকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিন। আর প্রতি পরীক্ষার শেষে PostMortem

করুন। দেখুন, কী কী ভুল করছেন। কোন্ কোন্ টপিক ভাল পড়া হয়নি ইত্যাদি। এবং তা সংশোধন করুন।

একটা প্রশ্নের উত্তর ভুল হবার পেছনে চারটি মূল কারণ আছে–

A. পড়া হয়নি
সবচেয়ে কমন কারণ। কোন প্রশ্নের উত্তর না জানলে ভুল তো হবেই।

B. মনে নেই
আপনি পড়েছিলেন কিন্তু পরীক্ষার হলে মনে করতে পারেননি।

C. পড়া প্রয়োগ করতে পারেননি
আপনার কোন অংকের সূত্র জানা আছে, কিন্তু কীভাবে প্রয়োগ করলে উত্তর মিলবে তা জানেন না। অথবা, লেখার পদ্ধতি জানা না থাকায় জানা প্রশ্ন ভুল করে এসেছেন।

D. অসাবধানতা
এ ভুল প্রায় সবারই হয়ে থাকে। পরীক্ষায় ভুল করে A-এর জায়গায় B দাগিয়ে এসেছেন। ৪টা প্রশ্নের জায়গায় ৩টা লিখে এসেছেন।

এজন্য, প্রতিটি পরীক্ষার পরই আপনার ভুলগুলোকে চিহ্নিত করুন। ভুলগুলোকে A, B, C, D এভাবে ভাগ করুন। দেখুন, কোন্ ধরনের ভুল আপনার বেশি হচ্ছে। নিজেকে মূল্যায়ন করুন। ধরুন, মিলি আর রকিব দু'জনেই ইংরেজীতে ১০০তে ৫০ পেয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে, আপনার মনে হতে পারে এরা দু'জনেই সমমানের ছাত্র। কিন্তু ভুলগুলো চিহ্নিত করে দেখলেন, মিলির বেশিরভাগ ভুল A ক্যাটাগরীর। আর রকিবের D ক্যাটাগরীর।

তা হলে, বুঝতেই পারছেন, রকিব অবশ্যই মিলির চেয়ে বেশি পড়ালেখা করেছে। কারণ, তার ভুলগুলো অসাবধানতাবশত, অথচ মিলির ভুলগুলো না পড়ার জন্য।

এভাবে আপনি নিজের ভুলগুলোকে চিহ্নিত করুন ও যথাযথ ব্যবস্থা নিন।

A. গ্রুপ

আপনার সমস্যার সমাধান হলো একটাই। পড়ুন। অনেকবার পড়ুন।

B. গ্রুপ

আপনার ভুল হচ্ছে মনে না থাকার জন্য। তাই মনে রাখার কৌশলগুলো প্রয়োগ করে পড়ুন। Mind Map বানান।

C. গ্রুপ

আপনার সমস্যা পড়া প্রয়োগ করতে না পারা। এজন্য আপনাকে পুরানো প্রশ্নপত্রে বা সারের বাসায় বা নিজে প্রশ্ন তৈরি করে পরীক্ষা দিতে হবে। প্রতিটা পরীক্ষার পর ভুলগুলোকে শুদ্ধ করে নিন।

D. গ্রুপ

যেহেতু অসাবধানতাই আপনার মূল সমস্যা তাই আপনাকে যা করতে হবে তা হলো–

১. প্রশ্নপত্র কমপক্ষে তিনবার পড়ুন

পরীক্ষার প্রশ্ন হাতে নিয়েই লিখতে বসবেন না। পুরো প্রশ্ন একবার ধীরে ধীরে পড়ুন। জানা-অজানা সব প্রশ্নই পুরোটা পড়ুন। এবার দ্বিতীয়বার পড়ুন এবং যে প্রশ্নগুলো সহজে লিখতে পারবেন সেগুলো দাগান। এবার তৃতীয়বার পড়ুন। যে কয়টা প্রশ্নের উত্তর আপনাকে লিখতে হবে সে অনুযায়ী প্রশ্ন নির্বাচন

করুন। ধরুন, ১৬টা প্রশ্নের মধ্যে ১২টা আপনাকে লিখতে হবে। আপনার ভালভাবে জানা প্রশ্নের সংখ্যা ৯টা। তৃতীয়বার পড়ার সময় বাকি ৩টি প্রশ্ন নির্বাচন করুন।

২. প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর লিখবার আগে একটু ভেবে নিন

জানা প্রশ্ন বা অংকের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায়, অর্ধেকে এসে ভুলে গেছেন। তাই প্রশ্ন লেখার আগে একটু ভেবে নিন। সবসময় চার্ট বা পয়েন্ট করে উত্তর লেখার চেষ্টা করুন। প্রতিটি প্রশ্নের শুরুতে আপনি কী বর্ণনা করবেন আর শেষে কী বর্ণনা করেছেন তা লিখুন আলাদা প্যারায়। এ দু'টো লাইন আপনাকে দু'টো মূল্যবান নম্বর এনে দেবে। তাই প্রশ্ন লেখার আগে ৩০ সেকেন্ড ভেবে নিন। কয় পৃষ্ঠার উত্তর হবে, কোথায় ছবি আঁকবেন বা চার্ট করবেন। এ কাজটা অভ্যাসে পরিণত করতে পারলে দেখবেন, যে কোন কঠিন প্রশ্ন আপনি অনেক সুন্দরভাবে গুছিয়ে লিখে আসতে পারছেন।

৩. রিভিশনের জন্য পর্যাপ্ত সময় দিন

রচনামূলক বা অবজেক্টিভ প্রশ্ন যাই হোক, রিভিশনের জন্য পর্যাপ্ত সময় রাখুন। আপনাকে পরীক্ষার হলে যাবার আগেই সময় হিসেব করে নিতে হবে। ধরুন, আপনার পরীক্ষার সময় ৩ ঘণ্টা। এ সময়ে আপনাকে ১০-টা প্রশ্ন অ্যানসার করতে হবে। এর মাঝে প্রশ্ন পড়া, খাতায় দাগ টানা, Attendance শীটে সাইন করার জন্য ১০ মিনিট, রিভিশনের জন্য ২০ মিনিট আলাদা রাখতে হবে। বাকি ১৫০ মিনিটে আপনার ১০-টা প্রশ্ন লিখতে হবে অর্থাৎ, প্রতি প্রশ্নে সর্বোচ্চ ১৫ মিনিট সময় পাচ্ছেন। ১৫ মিনিটে প্রশ্ন শেষ না হলে পরের প্রশ্নে চলে যান। কারণ, একটা ভাল উত্তরের চেয়ে দু'টো মাঝামাঝি উত্তর বেশি নম্বর এনে দেয়। রিভিশনের সময় বাকি থাকা প্রশ্নের উত্তর লিখবেন এবং বাসায় প্র্যাকটিস করবেন ১৫ মিনিটে উত্তর লেখার। অবজেক্টিভ প্রশ্নের

ক্ষেত্রে যেগুলো পারেন সেগুলো দাগাবেন, বাকিগুলো প্রশ্নপত্রে মার্ক করে রাখুন। রিভিশনের সময় সেগুলো দাগাবেন। আর খেয়াল রাখবেন সবসময় সোজা প্রশ্নের উত্তর আগে লিখবেন কারণ, আগে কঠিন প্রশ্ন লিখতে সময় নষ্ট করে কম নম্বর তুলে, হয়তো সোজা প্রশ্ন, যাতে পুরো নম্বর পেতেন, সেগুলো ভুল করে আসতে পারেন। তাই সহজ প্রশ্নের উত্তর আগে লিখুন।

৪. লিপ রিডিং করুন

পরীক্ষার হলে লেখার সময় ঠোঁট নেড়ে লেখার অভ্যাস করুন এতে আপনার লেখার গতি অনেক বেড়ে যাবে। আর ভুলের মাত্রাও কমবে।

৫. সুন্দর হাতের লেখা

একজন পরীক্ষক যখন খাতা দেখেন তখন তিনি আপনাকে দেখতে পাচ্ছেন না। তাঁকে মুগ্ধ করার জন্য আপনার প্রয়োজন সুন্দর হাতের লেখা। সুন্দর হাতের লেখা সব সময় আলাদা আবেদন তৈরি করে। একজন পরীক্ষককে একসাথে অনেকগুলো খাতা দেখতে হয়। বাস্তবতা হলো, তাঁরা সব খাতা সম্পূর্ণ পড়েন না। আপনি হয়তো অনেক পড়ে, অনেক প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু বাজে হাতের লেখা দেখে পরীক্ষক আপনাকে একটা এভারেজ নম্বর দিয়ে খাতা দেখে ফেললেন। ফলে, আপনার পরিশ্রম বৃথা হয়ে গেল। তাই হাতের লেখা সুন্দর হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। তা হলে চলুন শিখে নিই কীভাবে হাতের লেখা সুন্দর করবেন।

ছোটবেলায় আমার ছবি আঁকার হাতেখড়ি হয়েছিল চারুকলা থেকে পাস করা আনোয়ার সারের কাছে। আমার কাকের ঠ্যাং, বকের ঠ্যাং মার্কা হাতের লেখা দেখে সবাই খুব মজা পেত। আমার ছোট্টবেলার বন্ধু কামরুল আমার এহেন হাতের লেখা দেখে একদিন বলেছিল, 'এইটা কী লিখছস্, ক? হি হি। এইটা

ক' হইলে আমার নাম জামরুল।'

আনোয়ার সার ছবি আঁকা শেখানোর সাথে সাথে আমার হাতের লেখা ভাল করতেও উৎসাহ দিতেন। সারের হাতের লেখা এত সুন্দর ছিল যে, ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করত। তিনি আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন স্ট্রেট লাইন আঁকার। তিনি বলেছিলেন, 'যদি তুমি সরলরেখা আঁকতে পার, তা হলে যে কোন ছবি আঁকতে পারবে আর যে কোন হাতের লেখা কপি করতে পারবে।' এ কথা বলে তিনি ড্রইং খাতায় আড়াআড়িভাবে সরলরেখা আঁকা শুরু করলেন। পুরো পৃষ্ঠা ভরে যাওয়ার পর শুরু করলেন লম্বালম্বিভাবে সরলরেখা আঁকা। এরপর আমাকে বললেন, 'যখনই সময় পাবে, বাসার পুরানো খবরের কাগজ, খাতা, বই যা কিছুই হাতের কাছে পাবে, তাতে স্ট্রেটলাইন আঁকবে।'

আমি খুবই সুবোধ ও শান্তশিষ্ট বালক ছিলাম। সারের প্রথম আদেশ সরলরেখা আঁকা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করলাম। কিন্তু দ্বিতীয় আদেশ, মানে, পুরানো কাগজে আঁকা আমার মোটেই ভাল লাগত না। তাই আমার ভাই বোনদের বই-খাতা, বাসার নতুন ম্যাগাজিন, পত্রিকা সব এমনভাবে দাগাতাম যে কিছুই পাঠোদ্ধার করার উপায় থাকত না। ফলে, অচিরেই আমার সরলরেখা আঁকার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হলো।

কিন্তু এর ফলাফল ছিল অসাধারণ। বগুড়া রোটারী ক্লাবের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় আমি 'ক' শাখায় দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়ে গেলাম। আর ক্লাসে আমার হাতের লেখাই হয়ে গেল সবচেয়ে সুন্দর। এজন্য সারের অবদান অসামান্য। কারণ, তাঁর লেখা অক্ষরগুলোর উপর কলম ঘুরিয়ে আমি সুন্দর করে লেখা শিখেছি। হাতের লেখা সুন্দর করতে হলে একটু সময় দিতে হবে। আমি অনেক ধরনের হাতের লেখা কপি করতে পারি। সুন্দর হাতের লেখা দেখেই আপনাকে সুন্দর করে লেখা শিখতে হবে। এর জন্য প্রথমেই কলম বাছাই করুন। যে কলম ব্যবহারে আপনি স্বচ্ছন্দ

বোধ করেন, সে ধরনের কলম দিয়ে লিখুন। বাসায় বলপয়েন্ট কলম দিয়ে লিখলেও, পরীক্ষার খাতায় কালির কলম বা জেল পেন ব্যবহার করা ভাল। কারণ, এতে লেখা অনেক বেশি ঝকঝকে হয়। নীল আপনার পছন্দের রং হলেও অনেক পরীক্ষক নীল কালিতে লেখা পছন্দ করেন না। তাই কালো কালির কলমেই লিখুন।

এবার আপনার কোন বন্ধু যাঁর হাতের লেখা খুব সুন্দর, তাঁর খাতা চেয়ে নিন। এর কয়েক পাতা ফটোকপি করে ফেরত দিন। যদি আপনার পরিচিত কোন সুন্দর হাতের লেখা না পান তা হলে বিয়ের কার্ড বা দাওয়াত কার্ড নিয়ে বসুন। একেবারে নিরুপায় হলে নিন শিশুদের বর্ণমালা শেখার বই। আমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি বাংলা আর ইংরেজীতে নির্দিষ্ট কিছু অক্ষর লেখার স্টাইল বদলে ফেললেই হাতের লেখা সুন্দর হয়ে যায়। বাংলার ক্ষেত্রে অ, ট, ক, চ, স, ন, ড এ সাতটি অক্ষর লেখার ধরন বদলে ফেললে হাতের লেখা বদলে যায়। মনে রাখবেন, 'অ' যেভাবে লিখবেন, 'ত' সেভাবে লিখবেন 'ক' এর মত করে 'ব, র' লিখবেন। প্রথমে পুরানো খাতায় সরলরেখা আঁকা অভ্যাস করুন। অবশ্যই স্কেল ছাড়া। মোটামুটি সোজা আঁকতে পারলেই চলবে। এবার সুন্দর হাতের লেখার উপর হাত ঘুরিয়ে সাদা খাতায় এই সাতটা অক্ষর লিখুন। এবার কমপক্ষে তিন পৃষ্ঠা ভরে একইভাবে লেখা অভ্যাস করুন। এরপর যখনই ক্লাসে বা বাসায় লিখতে বসবেন, এ অক্ষরগুলো আসলেই আপনার অনুশীলন করা অক্ষরের মত করে লেখার চেষ্টা করুন। প্রথমদিকে আপনার কিছুটা কষ্ট হবে। দেখবেন আপনার পুরানো অক্ষরগুলো ঢুকে যাচ্ছে। কিন্তু কিছুটা সচেতন হলেই মোটামুটি সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই আপনার হাতের লেখা সুন্দর হয়ে যাবে। ইংরেজী লেখার ক্ষেত্রে এ অক্ষরগুলো হচ্ছে–

Aa, Bb, C, Ee, f, I, L, M, R, S, T.

লাইন সোজা রাখবার জন্য বাসায় বা ক্লাসে রুলটানা খাতায় লিখুন। লেখার মাঝে কাটাকাটি যথাসম্ভব কম করবেন। যদি কাটতে হয় অক্ষরের মাঝ বরাবর একটা মাত্র দাগ দিয়ে কাটবেন।

পরীক্ষার খাতায় লেখা শুরু করবার আগে অবশ্যই মার্জিন দেবেন। খাতার উপরে ও বাম দিকে পেন্সিল দিয়ে কমপক্ষে দেড় ইঞ্চি মার্জিন দেবেন। অনেক পরীক্ষকই খাতা ভাঁজ করা পছন্দ করেন না। মার্জিন দেয়া থাকলে পরীক্ষক ভাবতে বাধ্য হবেন যে, আপনি যথাযথ প্রস্তুতি নিয়েছেন। যে প্রশ্নের উত্তর লিখবেন, তা বড় হাতের অক্ষরে লিখে রঙীন কলম বা সাইনপেন দিয়ে আন্ডারলাইন করবেন। এজন্য বাংলা মাধ্যমের পরীক্ষায় প্রশ্নোত্তর নং–আর ইংরেজীতে 'Answer to the question no': লিখে তার নীচে দাগ টানুন। এ অংশ অবশ্যই মার্জিনের ভেতরে থাকবে। এর নীচে আরও ১ ইঞ্চি জায়গা খালি রেখে উত্তর লেখা শুরু করুন। যে কোন নতুন প্রশ্ন পৃষ্ঠার প্রথম থেকে শুরু করুন। আগের প্রশ্ন যদি পৃষ্ঠার শুরুতেই শেষ হয়ে যায়, তা হলেও সে পৃষ্ঠা ছেড়ে পরের প্রশ্ন পরবর্তী পৃষ্ঠায় শুরু করুন। পৃষ্ঠা উল্টানোর প্রয়োজন হলে P.T.O. লিখুন। প্রত্যেক প্রশ্ন লেখার সময় খেয়াল রাখবেন, যেন লেখার শেষে কিছু ফাঁকা জায়গা থাকে। কারণ, পরীক্ষার সময় তাড়াহুড়ো করে লেখায় অনেক জরুরী তথ্য বাদ পড়ে যায়। পরীক্ষার খাতায় ছবি আঁকলে তার ডান দিকে স্কেল দিয়ে লম্বা দাগ টানুন। এরপর ছবির বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করে তা সেই লাইন পর্যন্ত দাগ টানুন। লাইনের ডান দিকে তাদের নাম লিখুন। ছবির নীচে অবশ্যই ক্যাপশন দেবেন। এটা না লিখলে আপনি যত সুন্দরই আঁকুন কোন নম্বর পাবেন না। এরপর সময় থাকলে পুরো ছবিটা ক্যাপশন সহ একটা বক্সের ভেতর ঢুকিয়ে ফেলুন। অংক করার সময় পৃষ্ঠার কিছু অংশে বক্স করে তার ভেতর রাফ (যোগ,

বিয়োগ, গুণ, ভাগ) করুন। রাফ শেষ হলে বক্সে ক্রস চিহ্ন দিন।

মাথা

হাত

পা

চিত্র- মানুষ
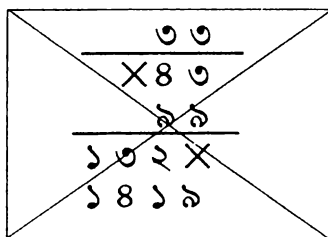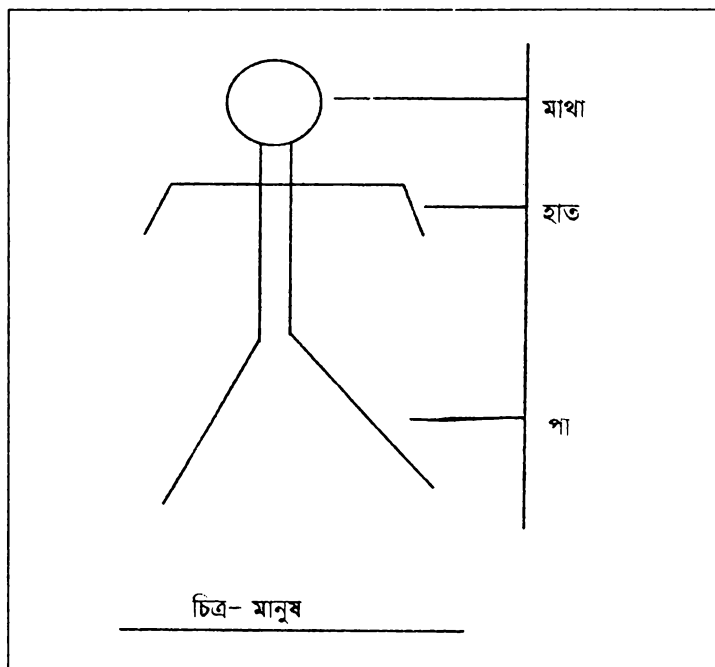
একটা প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের উত্তর একসাথে লিখুন। যদি কোন অংশ না পারেন তা হলে পর্যাপ্ত জায়গা রেখে পরবর্তী প্রশ্নে যান। খেয়াল রাখবেন যেন কোন পৃষ্ঠা একদম খালি না থাকে। ধরুন, কোন প্রশ্নের উত্তর লেখার জন্য তিন পৃষ্ঠা ফাঁকা রেখেছিলেন। কিন্তু দু'পৃষ্ঠাতেই আপনার লেখা শেষ। এক্ষেত্রে পরবর্তী পৃষ্ঠায় বড় করে P.T.O. লিখে দিন।

অবশেষে, আমার বন্ধু বাবুর কাছ থেকে শোনা একটা ঘটনা দিয়ে শেষ করছি। বাবুর বাসা ছিল রাজশাহীতে। ক্লাসের ফার্স্টবয় ছিল তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সে ছেলেটা S.S.C-তে রাজশাহী বোর্ডে 1st stand করেছিল। H.S.C.পরীক্ষার শেষ দিন ছিল অংক পরীক্ষা। পরীক্ষা শেষে তার মুখ অন্ধকার। এতদিন যারা ঈর্ষায় জ্বলত, তারা এবার ভাল একটা উপলক্ষ পেয়ে আনন্দে উদ্বেলিত। নিশ্চয়ই শালার অংক ভুল হইছে। সবাই চাপা আনন্দ নিয়ে, গভীর আগ্রহে তাকে জিজ্ঞেস করছে, 'কোন্‌টা পারিস নাই? কোন্‌টা ছাড়লি?' কিন্তু সে কিছুই বলতে চাইছে না। শুধু বলল, 'পরীক্ষা খুব খারাপ হইছে।' সবাই উল্লসিত হয়ে চলে যাবার পর বাবু জানতে চাইল, 'সত্যি করে বল তো কী হইছে?'

সে কান্নাভেজা কণ্ঠে বলল, 'ঘণ্টা দেবার সাথে সাথেই সার খাতা টাইনা নিছে। শেষ পৃষ্ঠায় মার্জিন দিতে পারি নাই।'

সময় নিয়ন্ত্রণ
যিনি সময়কে নিয়ন্ত্রণ করেন তিনি তাঁর ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করেন

একটা মজার ব্যাপার হলো আপনি ভিক্ষুক হোন বা হোন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আল্লাহ দু'জনকেই দিনে ২৪ ঘণ্টা সময় দিয়েছেন। কাউকেই কমবেশি দেননি। এই প্রতিদিনের ২৪ ঘণ্টা যাঁরা কাজে লাগিয়েছেন তাঁরাই আজ পৃথিবীতে স্মরণীয়, বরণীয়। আর যাঁরা আলস্যে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন তাঁরা হারিয়ে গেছেন সবার স্মৃতি থেকে। তাই আপনাকে সারভাইভ করতে হলে জানতেই হবে সময়ের নিয়ন্ত্রণ।

কিছুদিন আগে বিল গেটস বাংলাদেশে এসেছিলেন। তাঁর সেক্রেটারী পত্রিকা অফিসে একটি টাইমটেবিল পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর ৮ ঘণ্টার সফরে কোন্ সময় কী করবেন তা মিনিট হিসেবে সে কাগজে লেখা ছিল। যেমন–দুঃস্থ শিশুদের সাথে কথা বলবেন ১৫ মিনিট, মিটিং করবেন ৩০ মিনিট ইত্যাদি। এরপর তিনি যখন আসলেন দেখা গেল প্রতিটি কাজ তিনি একেবারে সেকেন্ড হিসেব করে করেছেন। বাংলাদেশের যানজট, যোগাযোগের অব্যবস্থা কোনকিছুই তাঁর সময়ের হেরফের করাতে পারেনি। আপনার হয়তো মনে হতে পারে তাঁর জীবনযাপন যান্ত্রিক। কিন্তু খেয়াল রাখবেন, বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সব দেশের ৮০ ভাগ কম্পিউটার তাঁর কোম্পানীর তৈরি। তাঁর সৎপথে উপার্জিত টাকা দিয়ে তিনি বাংলাদেশের ৫০ বছরের

বাজেট একাই করতে পারেন। সময়ের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহারের কারণেই তিনি প্রতি ঘণ্টায় ১০ মিলিয়ন ডলার বা ৭০ কোটি টাকা আয় করেন। তাই জেনে রাখুন, আপনি যত বড়ই প্রতিভা হোন না কেন, সময় নিয়ন্ত্রণ না করতে পারলে আপনি নিশ্চিতভাবে ব্যর্থ হবেন।

আপনি হয়তো বিখ্যাত সেতার বাদক পণ্ডিত রবিশঙ্করের নাম শুনে থাকবেন। সেতারের তিন তারে ৩০ হাজারের মত মূল সুর তোলা সম্ভব। এর প্রতিটি সুরের আলাদা আলাদা নাম আছে। এর যে কোন একটা সুর আপনি তাঁকে বাজাতে বলবেন, তিনি তা বাজিয়ে শোনাবেন। তা কম্পিউটারের সাথে মিলিয়ে দেখবেন যে, সুরটা সঠিক হয়েছে। এও কি সম্ভব! আপনি বলতেই পারেন তিনি একজন জিনিয়াস। কিন্তু এর জন্য তাঁকে কতটা সময় দিতে হয়েছে জানেন? মাত্র ১৬ বছর। সত্যি! ১৬ বছরের প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা ওস্তাদের কাছে শিখেছেন। আর ১০ ঘণ্টা নিজে বাজিয়েছেন। ১৬ বছরের প্রতিটা দিন তিনি বাজিয়েছেন। ১৬×৩৬৫×১৮=১০৫১২০ ঘণ্টা তিনি সেতার বাজিয়েছেন। তাই সারা পৃথিবী রবিশংকরকে সম্মান করে।

তা হলে এবার একটু আমরা নিজেদের দিকে তাকাই। খাওয়া ও ঘুমানো ছাড়াই একজন বাংলাদেশী গড়ে ৬ ঘণ্টা অপচয় করেন প্রতিদিন। এ সময় আমরা বিভিন্ন আড্ডা, চুপচাপ বসে থাকা বা ঘুরতে বেড়াতে ব্যয় করি। তা হলে, যদি আমরা ৮০ বছর বাঁচি তা হলে, ৮০ বছরে=৩৬৫×৬=২১৯০×৮০=১৭৫২০০ ঘণ্টা অর্থাৎ, প্রায় ২০ বছর আমরা অলসতা করে কাটিয়ে দিই। একটু ভেবে দেখুন, জীবনের এ বিশটা বছর যদি আপনি সেতার বাজাতেন তা হলে পৃথিবীতে আপনিই হতে পারতেন শ্রেষ্ঠ সেতারবাদক। এখন আপনার ইচ্ছা আপনি কী করবেন। আপনি যা হতে চাইবেন তাই হতে পারবেন। আর এজন্য শিখতে হবে সময়ের নিয়ন্ত্রণ।

আমাদের প্রত্যেকেরই কাজের সুনির্দিষ্ট শ্রেণীবিভাগ আছে। কিন্তু আপনাকে জানতে হবে কোন্ কাজগুলো আপনাকে লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করে।

আমরা অর্থাৎ ছাত্ররা কাজের সময়কে মোটামুটি এভাবে ভাগ করি।

[P দিয়ে Priority বা প্রাধান্য বোঝানো হয়েছে]

	আর্জেন্ট	নন-আর্জেন্ট
	P1	P2
নির্দিষ্ট লক্ষ্যযুক্ত কাজ	(ক) পরীক্ষার পড়া (খ) বাড়ির কাজ (গ) প্র্যাকটিক্যাল করা	(ক) ক্লাসের আগে পড়া (খ) Mind Map বানানো (গ) পরীক্ষার পূর্বপ্রস্তুতি (ঘ) নিয়মিত ব্যায়াম
	P3	P4
লক্ষ্যহীন কাজ	(ক) যে কোন বাধাবিঘ্ন (খ) ফোনে কথা বলা (গ) নির্দিষ্ট টিভি প্রোগ্রাম দেখা (ঘ) নির্দিষ্ট সময়ে ইন্টারনেটে চ্যাটিং	(ক) TU.C. দেখা (খ) গল্পের বই পড়া (গ) গান শোনা (ঘ) দিবাস্বপ্ন দেখা (ঙ) আড্ডা দেওয়া, বেড়ানো (চ) অসময়ে অতিরিক্ত ঘুম

এখন দেখুন, নির্দিষ্ট লক্ষ্যযুক্ত কাজগুলো আমাদের সফল হতে সাহায্য করে। অন্যদিকে, লক্ষ্যহীন কাজ আমাদের বিনোদনে সাহায্য করে। এখন যদি P3 আর P4 গ্রুপের কাজ আপনি বেশি করেন তা হলে আপনার লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে না। যদিও আপনার মনে হবে আপনি অনেক পরিশ্রম করেছেন, কিন্তু লাভ হয়নি।

আবার P1 কাজগুলো আপনাকে তাৎক্ষণিক ভাবে করতে হয় দেখে আপনার পড়ালেখার মান যথাযথ হয় না। ফলে, অনেক পড়েও আপনার রেজাল্ট আহামরি কিছু হয় না।

এবার দেখুন, অধিকাংশ ছাত্র তাঁদের সময়কে কীভাবে ব্যয় করেন:

P3-50% সময়
P1-30% সময়
P4-15% সময়
P2-05% সময়

কিন্তু আপনাকে জীবনে সফল হতে হলে সময় বণ্টন করতে হবে এভাবে,

P2-60% সময়
P1-20% সময়
P3-15% সময়
P4-05% সময়

অর্থাৎ, বছরের ক্লাস শুরুর দিন থেকেই আপনাকে পড়া আরম্ভ করতে হবে। আর সারা বছরের পড়া শুরুতেই প্ল্যান করে ফেলতে হবে, কবে কী পড়বেন। এজন্য একটি বাৎসরিক প্ল্যানার কিনতে পারেন। অনেক ডায়রীতেও এখন প্ল্যানার দেওয়া থাকে। যদি তা না থাকে, তা হলে নরমাল সাদা খাতায় প্ল্যান লিখতে পারেন।

এতে নির্দিষ্ট কতগুলো ধাপ আছে। তা হলে, আসুন শিখে নিই কীভাবে বছরের প্ল্যান তৈরি করবেন। অবশ্যই হাতের কাছে ক্যালেন্ডার রাখুন।

ধাপ-১: প্রধান ঘটনাগুলোকে মার্ক করুন

আপনার প্রথম কাজ হচ্ছে বিভিন্ন সাময়িক পরীক্ষার সময়সূচি চিহ্নিত করা। এছাড়া ঈদের দিন, বার্থডে আর যে দিনগুলোতে আপনি ব্যস্ত থাকবেন, সেগুলো দাগিয়ে ফেলুন বা লিখে ফেলুন।

ধাপ-২: সিলেবাস নির্দিষ্ট করুন ও লিখে ফেলুন

প্রতিটি বই খুলুন। এতে কতগুলো চ্যাপ্টার আছে তা লিখুন। ধরুন, বাংলায় ১৫টি গল্প, ১৫টি কবিতা আছে। অংকে আছে ১২টি চ্যাপ্টার। এভাবে সব সাবজেক্টের চ্যাপ্টার লিখে ফেলে একটি ছক তৈরি করুন। লিখুন, প্রতি সাময়িক পরীক্ষায় আপনাকে প্রত্যেক সাবজেক্টের কয়টা করে চ্যাপ্টার পড়তে হবে।

ধাপ-৩: পুরো বছরের প্ল্যান করুন

ধরুন, আপনার প্রথম সাময়িক পরীক্ষা তিনমাস পর। এ তিন মাসে আপনাকে বাংলা ৩ চ্যাপ্টার, বিজ্ঞান ৪টি, অংকে ৪টি চ্যাপ্টার পড়তে হবে। তা হলে, প্রতিমাসে আপনার বাংলা ১টি চ্যাপ্টার, বিজ্ঞান ২টি, অংক ২ টি করে চ্যাপ্টার পড়তে হবে। এভাবে বছরের প্রতিমাসের পাশে লিখুন কোন্ সাবজেক্টের কয়টা চ্যাপ্টার পড়তে হবে। শুধু সংখ্যা বা চ্যাপ্টারের নম্বর উল্লেখ করুন। এবার এ মাসের ক্যালেন্ডার নিয়ে বসুন। এখন এ মাসের প্রতিদিন যে যে সাবজেক্ট পড়বেন তা প্রতিদিনের নীচে লিখে ফেলুন। এজন্য প্রতি সাবজেক্টকে একটি নম্বর আকারে রাখুন। ধরুন বাংলা-১, ইংরেজী-২, অংক-৩, সমাজ-৪ ইত্যাদি।

প্রতিদিনের নীচে লিখুন নম্বরগুলো। যেমন–
February 07

Sun	Mon	Tue	Wed	Thurs	Fri	Sat
				1 (১) (৩)	2	3 (৩) (৪)
4 (২) (৪)	5 (৫) (৬)	6 (১) (৪)	7 (৩) (৫)	8 (৬) (১)	9	10 (২) (৩)
11 (৩) (৪)	12 (৩) (৬)	13 (২) (৩)	14 (১) (৪)	15 (২) (৩)	16	17 (১) (৪)
18 (২) (৪)	19 (৩) (৬)	20 (৫) (৩)	21 (১) (২)	22 (৫) (৬)	23	24 (৩) (৪)
25 (৩) (৫)	26 (৪) (৬)	27 (১) (২)	28 (৩) (৪)			

১–বাংলা
২–ইংরেজী
৩–অংক
৪– বিজ্ঞান
৫–ধর্ম
৬–সমাজ

ধাপ-৪: সাপ্তাহিক প্ল্যান করুন

এবার ডায়রী বা খাতার দু'টো পাশাপাশি খালি পাতা নিন। আজকের দিন থেকে বাম ও ডান পৃষ্ঠায় চারটি করে ভাগ করুন। আজকের দিন থেকে শুরু করুন। সপ্তাহে একদিন রাখুন মূল্যায়ন বা ছুটির দিন হিসেবে। এবার নীচের মত ডিটেলসে লিখুন এ সপ্তাহে কী পড়বেন।

February 07	February 07
3. Sat বাংলা-১টি গল্প -১টি Mind Map. অংক-১০টা	7. Wed অংক-১০টা ধর্ম-৩টি প্রশ্ন
4. Sun ইংরেজী-২টি প্রশ্ন বিজ্ঞান-২টি Mind Map ২টি অংক	8.Thurs বাংলা-১টি রচনা সমাজ-১টি Mind Map
5. Mon ধর্ম ১টি চ্যাপ্টার সমাজ-৩টি প্রশ্ন ১টি Mind Map	9. Fri রিভিশন টিভি, গান, গল্পের বই
6. Tue বাংলা-১টি কবিতা বিজ্ঞান-১টি Mind Map ৩টি প্রশ্ন	10. Sat ইংরেজী-১টি Passage ১টি Essay. অংক-১০টি

ধাপ-৫: দৈনিক রুটিন করুন

প্রতি সপ্তাহের শুরুতে আগামী দিন কী কী পড়তে হবে তা দেখে নিন। এবার ঘুমানোর আগে পরবর্তী দিনের রুটিন তৈরি করুন। এ রুটিনে P1-P4 পর্যন্ত সব ধরনের কাজ তাদের নামসহ উল্লেখ

করুন। একটি ছোট প্যাডে দিনের নাম, তারিখ লিখে সময় দিয়ে প্রতিটি কাজ উল্লেখ করুন। কাজগুলো নম্বর দিয়ে বা পয়েন্ট আকারে লিখবেন। একটা কাজ শেষ হওয়া মাত্র তাতে টিক চিহ্ন দিন আর বাকি থাকলে ক্রস চিহ্ন দিন। যদি P1 বা P2 কাজ বাকি থাকে তা হলে তা পরবর্তী দিনের P3 বা P4 কাজের জায়গায় যোগ করুন। এতে আপনার মাঝে দায়বদ্ধতা সৃষ্টি হবে। কারণ, কোন জরুরী কাজ বা পড়া ফেলে রাখলে পরের দিন আপনার প্রিয় নাটক দেখা বাদ দিতে হবে। ফলে, ফাঁকি দেবার মাত্রা কমে আসবে। প্রতিদিনের রুটিন যে কাগজে লিখবেন তার দু'টি কপি রাখবেন। একটা থাকবে বাসায়। আরেকটা আপনার শার্টের পকেটে বা হ্যান্ডব্যাগে। প্রতি ঘণ্টায় অন্তত একবার রুটিনে চোখ বুলান। তা হলে এখন একটা ডেইলি রুটিনের উদাহরণ দেখুন।

Sunday 4.2.07

Time	**Work to be done**
5.00 am–6.00 am	P3–Prayer, Meditation, Exercise, Breakfast.
6.00 am–7.00 am	P1–Home work.
7.00 am–3.00 pm	P1+P2–School time.
3.00 pm–4.30 pm	P4–Sleep.
4.30 pm–5.30 pm	P2–Mind Map.
5.30 pm–6.30 pm	P3–TV, Playing.
6.30 pm–9.30 pm	P2–Mind Map, Notes.
9.30 pm–11.00 pm	P4–Dinner, TV
11.00 pm–12.00 am	P1+P2–Revision+Practical.

মুহূর্তে সজীব হয়ে উঠুন

একটা সময় ছিল যখন আমি কখনোই সময়মত পড়া শুরু করতে পারতাম না। ধরুন, সাতটায় পড়তে বসেছি, ৯টায় টিভিতে সিন্দবাদ হবে। আমার মাথায় সিন্দবাদের ভূত চেপে বসে আছে। এদিকে পড়তে ভীষণ বোরিং লাগছে। চোখ ঢুলু-ঢুলু, গলায় জোর নেই। একই লাইন, একই পৃষ্ঠা বারবার পড়ছি। কিন্তু, মাথায় কিছু ঢুকছে না। যেই না ৯টা বাজল, এগুলো সব মুহূর্তেই দূর হয়ে গেল। এখন আর ঝিম ধরা ভাব নেই। আপনার কি কখনও এমন হয়েছে?

আমরা একটু চেষ্টা করলেই আমাদের এই অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। আমাদের শরীর আর মন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এর যে কোন একটাকে পরিবর্তন করলে অন্যটারও পরিবর্তন ঘটে। যেহেতু, মন খুবই জটিল জিনিস তাই আমাদের লক্ষ্য হবে শরীরকে পরিবর্তনের মাধ্যমে মনকে নিয়ন্ত্রণ করা। পাশ্চাত্যের মেডিটেশন আর প্রাচ্যের ধ্যান যুগ-যুগ ধরে এ নীতির উপর চলে আসছে। আপনি একটু খেয়াল করলেই দেখতে পাবেন, কোন আনন্দের সংবাদ পেলে আপনার মাঝে কিছু নির্দিষ্ট পরিবর্তন ঘটে। ঠিক একইভাবে, বোরিং অবস্থাতেও আপনার অবস্থার নির্দিষ্ট পরিবর্তন ঘটে। যেহেতু, আনন্দ বা দুঃখের সংবাদকে আপনি পরিবর্তন করতে পারবেন না, তাই পরিবর্তন করুন আপনার প্রতিক্রিয়াকে। জীবনে অনেক অপ্রত্যাশিত বাজে খবর

নিয়মিত আসতেই থাকে। যেমন–কোন নিকটাত্মীয়ের মৃত্যু, প্রেমে ব্যর্থতা, বন্ধুত্ব ভেঙে যাওয়া ইত্যাদি। এ সময়গুলোতে পড়ালেখা করাটা অসম্ভব মনে হয়। কিন্তু আপনাকে আপনার ইমোশনকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। না হলে জীবনে সফল হওয়া যাবে না।

এখন জেনে নিন কোন্ কোন্ শারীরিক অবস্থা আপনার মানসিক অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে–

১. আপনার Posture বা শারীরিক ভঙ্গি (আপনার কাঁধ কি নীচের দিকে নামানো না সমান্তরাল)
২. আপনার Facial Expression বা মুখভঙ্গি (হাসিমুখ না দুঃখীমুখ)
৩. আপনার শ্বাসের প্রকৃতি (গভীর না অগভীর। ধীর না দ্রুত)
৪. আপনার মুখের ও শরীরের মাংসপেশী (টানটান না শিথিল)
৫. আপনার কণ্ঠস্বর (জোরাল না উচ্ছ্বাসহীন, নির্জীব)

এবার আসুন দেখে নিন এগুলো কীভাবে আপনাকে প্রভাবিত করে।

অনুশীলনী–১

কল্পনা করুন আপনি এখন বড় একটা দুঃসংবাদ পেয়েছেন। আপনার এখন আর কিছুই করার নেই। এ দুঃখটাকে অনুভব করুন। সত্যিকার দুঃখ পেলে আপনার শারীরিক যে পরিবর্তন ঘটে তা ঘটতে দিন। দুঃখ পেলে যেভাবে বসেন সেভাবে বসুন, আপনার মুখভঙ্গি, শ্বাস নেবার প্রকৃতি সব সে অবস্থানে নিয়ে যান। দু'মিনিট পর পরবর্তী প্যারা পড়ুন।

এখন লক্ষ করুন। দুঃখ পেলে আপনার কাঁধ নীচে নেমে

আসে। মুখ আর শরীরের পেশীগুলো শিথিল হয়ে আসে। চোখের পাতা নীচে নেমে আসে। শ্বাস-প্রশ্বাস হয় দ্রুত আর অগভীর।

অনুশীলনী–২

এবার কল্পনা করুন আপনি খুবই আনন্দের কোন সংবাদ পেয়েছেন। এখন, খুশির খবর পেলে আপনি যেমনভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন তেমন অবস্থায় চলে যান। খুশিতে আপনি দাঁড়িয়ে পড়ুন বা বসে থাকুন। যেভাবে আপনি আপনার আনন্দ প্রকাশ করেন তা করুন। দু'মিনিট পর পরবর্তী প্যারা পড়ুন।

এখন লক্ষ করুন। আপনার কাঁধ দুটো উপরে উঠে প্রায় সমান্তরাল হয়ে গেছে। আপনার শিরদাঁড়া সোজা হয়ে গেছে আপনার চোখ স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি উন্মুক্ত। আপনার শ্বাস-প্রশ্বাস গভীর আর ধীর। আপনার মুখ আর শরীরের পেশী টান-টান।

এখন এই অবস্থার কোন পরিবর্তন না করে কোন দুঃখের কথা চিন্তা করুন। No cheating, please. দেখুন, এটা অসম্ভব। যখনই আপনি দুঃখের কথা চিন্তা করতে যাবেন তখনই আপনার শারীরিক অবস্থা অনুশীলনী-১-এর মত হতে হবে। আমি যে ৫টি নির্দেশকের কথা উল্লেখ করেছি, তার একটাও যদি পরিবর্তন না করেন, তা হলে দুঃখের বিষয় আপনি চিন্তা করতে পারবেন না।

কাজেই, যখনই আপনি দুঃখের বিষয় ভাবতে বসবেন বা আপনার পড়ার মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে, তখনই এ ৫টি বিষয় খেয়াল রাখুন। এ পাঁচটি বিষয় একটি কাগজে লিখে সব সময় সাথে রাখুন। দিনের যে কোন সময় যখনই আপনি ক্লান্ত বা দুঃখবোধ করবেন এটি দেখে নিজের অবস্থা বদলে ফেলুন। এ ক্ষমতা আপনারই হাতে। সৃষ্টিকর্তা আপনাকেই এ ক্ষমতা

দিয়েছেন। তাই, নিজেকে কন্ট্রোল করুন।

অনুশীলনী–৩

এবার আপনার প্রিয় শিক্ষককে কল্পনা করুন। দেখুন, আপনি চিন্তা করবার সময় ছবি আর কথার মাধ্যমে চিন্তা করছেন। অর্থাৎ, আপনি সারের ছবি কল্পনা করছেন আর মনে মনে কথা বলছেন নিজের সাথে। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ প্রতিদিন গড়ে ৬০ হাজার বার নিজের সাথে কথা বলে থাকেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো এর ৮০ ভাগই হলো নেতিবাচক কথা। আমাদের ব্রেন অনেকটা কম্পিউটারের মত আর আপনার মন এর কমান্ড করে থাকে। তাই যদি আপনি তাকে শুধু নেতিবাচক কথা শোনাতে থাকেন তা হলে সে আপনার কথাকেই সত্য ধরে নিয়ে কাজ করবে। সব সময় নিজেকে ভালবাসুন, শ্রদ্ধা করুন। বিশ্বাস করুন, পৃথিবীতে আপনি অনন্য। সারা পৃথিবীর প্রাণীকুলের মধ্যে আপনার মত আর কেউ নেই। আপনার এ অনন্যতাকে ভালবাসুন। যখন কোন কাজে যথাযথ ফলাফল লাভে ব্যর্থ হবেন তখন মনে মনে বলুন, এ থেকে আমি কী শিখলাম?

যা শিখলাম তা আমি ভবিষ্যতে কীভাবে কাজে লাগাব? দেখবেন, খুব দ্রুত আপনি একজন পজিটিভ ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠছেন।

এখন, পড়তে বসবার আগে নিজেকে Powerful অবস্থায় নিয়ে আসুন। তার জন্য দরকার একটি Anchor. আপনি নিজেই তা তৈরি করতে পারেন বা অনুসরণ করতে পারেন আমার Anchor. তা হলে, নীচের ধাপগুলো অনুসরণ করুন–

১. কল্পনা করুন

আপনার জীবনের সবচেয়ে আনন্দঘন মুহূর্তকে কল্পনা করুন।

২. অনুভব করুন
সে সময়ের স্মৃতিতে ঢুকে যান। তখন আপনার যে অনুভূতি ছিল তা অনুভব করুন। কল্পনার দৃশ্যকে সজীব করুন। রং আর শব্দ বাড়িয়ে দিন।

৩. শারীরিক অবস্থার পরিবর্তন করুন
আপনার শরীরকে সেই সময়ের অবস্থানে নিয়ে যান। প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে পড়ুন। সমস্ত সত্তা দিয়ে উপলব্ধি করুন শরীরের মাঝে সেই উদ্যমকে।

৪. Anchor ব্যবহার করুন
এখন আপনার পছন্দমত কোন শব্দ বা ধ্বনি মুখে উচ্চারণ করুন আর নির্দিষ্ট শারীরিক ভঙ্গিমা করুন। আমার Anchor হলো জোরে 'Oh Yeah' উচ্চারণ করা আর সেই সাথে দু'হাত মুষ্টিবদ্ধ করে কনুই বরাবর ভাঁজ করে পেছনে টেনে নেয়া। যেমন, ফুটবলাররা গোল দেয়ার পর করে থাকেন। মনে রাখুন, একটি শব্দ আর একটি নির্দিষ্ট শারীরিক ভঙ্গিমা অনুশীলন করতে হবে।

৫. কয়েকবার Anchor-এর পুনরাবৃত্তি করুন।

৬. এবার যখনই পড়তে বসবেন বা কাজ করবেন তার আগে Anchor করে নিন।

Anchor
এর লাভ
পৃথিবীখ্যাত খেলোয়াড়, নাট্যকার, লেখক, বিজ্ঞানী, ব্যবসায়ী প্রায় সবাই Anchor ব্যবহার করেন। এটি তাঁদের কাজের মান ও

উদ্যমকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। একটা প্রমাণ দিই। আপনি মুখে কোন শব্দ না করে, এবং শারীরিক কোন পরিবর্তন না করে, এখনই আপনার সামনের টেবিল বা দেয়ালে বা চেয়ারে জোরে ঘুষি মারুন। এবার, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে Anchor করুন এবং শব্দটা উচ্চারণ করার সাথে সাথে টেবিলে ঘুষি মারুন। দেখুন আপনার শক্তি আগের বারের তুলনায় অনেক বেশি হয়ে গেছে, তাই না? অনেকেরই বিচিত্র ও মজার Anchor আছে। যেমন–বিখ্যাত বাস্কেটবল প্লেয়ার মাইকেল জর্ডানের Anchor হলো জিভ বের করে নাড়ানো। আপনার Anchor তৈরি হলে চলে আসুন সর্বশেষ অধ্যায়ে।

The Final Countdown

আপনি এতক্ষণ যা পড়লেন তার সারসংক্ষেপ এ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। তাই চলুন দেখে নিন মূল আইডিয়াগুলো। আপনি এখন বছরের মাঝামাঝি বা শুরু যে অবস্থাতেই থাকুন নীচের স্টেপগুলো ফলো করুন–

১. একটি নির্দিষ্ট উচ্চ লক্ষ্যমাত্রা তৈরি করুন।

২. এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটা স্টাডি শিডিউল তৈরি করুন। প্রথমে বছরের, তারপর মাসের, সপ্তাহের ও দৈনিক রুটিন তৈরি করুন। নিজের মূল্যায়ন করুন।

৩. প্রতিদিন গড়ে ৬ ঘণ্টা পড়ুন। প্রতি স্টাডি সেশনে ২ ঘণ্টা পড়ুন। এ দু'ঘণ্টার সেশনকে চারটি ভাগে ভাগ করে নিন। প্রতিভাগের মাঝে ৫ মিনিট বিরতি নিন। পরবর্তী সেশন শুরু করবার আগে আধঘণ্টা বিশ্রাম নিন।

৪. প্রতিদিন স্টাডি সেশন শুরুর আগে ১০ মিনিট গত দিনের পড়া রিভিশন দিন। স্টাডি সেশনের শেষ ১০ মিনিট আজকের পড়া রিভিশন দিন।

৫. দিনে কমপক্ষে একটি Mind Map তৈরি করুন।

৬. আপনার পড়ার ঘরে High power-এর বাল্ব লাগান। কারণ, প্রচুর আলো আপনার পড়ার মনোযোগ বৃদ্ধি করবে।

৭. আপনার ঘরে মুক্ত বাতাস প্রবেশ করতে দিন। আর ঘরের তাপমাত্রা কম রাখুন। পড়া লেখার জন্য আদর্শ তাপমাত্রা ১৯° সেলসিয়াস। আমাদের দেশে যদিও এটা পাওয়া কঠিন, তবুও চেষ্টা করুন হালকা জামাকাপড় পরতে।

৮. পড়ার ঘরে টিভি, রেডিও, গল্পের বই রাখবেন না। পড়া শুরুর আগে মোবাইল ফোন বন্ধ রাখুন বা সাইলেন্ট করে রাখুন।

৯. অবসরে গান বা মিউজিক শুনুন। কারণ, মিউজিক আপনার ব্রেনের মনোযোগ ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

১০. যে কোন পড়াই প্রথমে নিজে পড়ুন, ঠিকমত বুঝুন, তারপর বন্ধুদের সাথে আলোচনা করুন। দেখুন তাঁরা কীভাবে পড়েন। আপনার চেয়ে ভাল ছাত্রের সাথে মিশুন। যদি আপনিই ক্লাসের সবচেয়ে ভাল ছাত্র হোন, তা হলে সিনিয়র ছাত্রদের কাছে টিপস নিন। যে কোন সারকে প্রশ্ন করুন। সাররা প্রশ্ন শুনতে ও জবাব দিতে আগ্রহ বোধ করেন।

এবার জেনে নিন, পরীক্ষা দেবার কিছু টিপস

পরীক্ষার আগের রাতে দ্রুত ঘুমিয়ে পড়ুন। কখনোই Diazepum বা ঘুমের ওষুধ খাবেন না। কারণ, তা অনেক সময় সাময়িক স্মৃতিকে মুছে ফেলে। ঘুম না এলে মেডিটেশন করুন। পরীক্ষার দিন সকাল-সকাল ঘুম থেকে উঠুন। আর যা করতে হবে তা হলো–

১. দ্রুত পরীক্ষার হলে পৌঁছন

কমপক্ষে ১ ঘণ্টা আগে পরীক্ষার হলে পৌঁছন। আপনার সীট কোন্ রুমে, কত নম্বর বেঞ্চে, সব দেখে নিন। এতে আপনার মানসিক চাপ অনেকটা কমে যাবে।

২. পরীক্ষা নিয়ে টেনশন করবেন না এবং পড়বেন না

আপনি যদি এতদিন ঠিকমত পড়ে থাকেন তা হলে পরীক্ষার দিন আর পড়বেন না। কারণ, আগের রাতেই ঘুমের মাঝে আপনার ব্রেন প্রশ্নোত্তরগুলোকে সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে। এখন, নতুন তথ্য শিখতে গেলে নানান ঝামেলা হবে। যদি বিকেলে পরীক্ষা হয় তা হলে রিভিশন দিয়ে যেতে পারেন। Mind Map-গুলোতে চোখ বুলিয়ে পরীক্ষার হলে যান। প্রয়োজনীয় সংখ্যক কলম, পেন্সিল, মার্কার, রাবার সব আগের রাতেই গুছিয়ে রাখুন। দরকার হলে স্টাপলারও নিয়ে যান। খাবার স্যালাইন বা টেস্টি স্যালাইন বা গ্লুকোজ বানিয়ে নিয়ে যান। তিন ঘণ্টার পরীক্ষা হলে ১.৫ ঘণ্টার পর ৫ মিনিট বিশ্রাম নিন। স্যালাইন খান। নিজের লেখাগুলো চেক করুন। এ ৫ মিনিট বিশ্রাম আপনার শেষ ১.৫ ঘণ্টার পরীক্ষা অনেক সহজ করে দেবে।

৩. নিজের সাথে কথা বলুন

নিজেকে বলুন, আমি পারি, আমি পারব। আমার পরীক্ষা

সবচেয়ে ভাল হবে ইনশাল্লাহ। অনেক ভাল ছাত্রকেই কেমন পড়েছে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা উত্তর দেন, 'কিছুই পড়িনি।' এ ধরনের কথা তাঁদের জন্য ক্ষতিকর। আমাদের ব্রেন অনেকটা কম্পিউটারের মত। সে চলে মনের কমান্ডে, তাই কম্পিউটারে বন্ধ হবার নির্দেশ দিয়ে আপনি যদি কাজ করতে চান তা অসম্ভব। আপনার নেতিবাচক কথা আপনার ব্রেনের চিন্তা করার পথ বন্ধ করে দিতে পারে। ফলে, দেখবেন, আপনার মুখস্থ পড়া পরীক্ষার হলে মনে আসছে না। তাই, সবসময় বলুন, আমি ভাল পড়ালেখা করেছি। আমি ভাল পরীক্ষা দেব।

৪. Anchor করুন

পরীক্ষা শুরুর কিছু আগে Anchor করুন। আপনার সবচেয়ে কনফিডেন্ট অবস্থায় চলে আসুন। হাসিমুখে, শিরদাঁড়া সোজা করে, কাঁধ উঁচু করে চোখ দু'টো পুরোপুরি খুলে পরীক্ষায় বসুন।

৫. সহজ প্রশ্ন আগে, কঠিন প্রশ্ন পরে

প্রথমেই সময় ঠিক করে নিন। ১০ টায় পরীক্ষা শুরু হলে ১১ টায় কয়টা প্রশ্নোত্তর শেষ হবে তার আইডিয়া রাখুন। প্রতিটি প্রশ্নের জন্য সর্বোচ্চ সময় নির্ধারণ করুন। এ কাজগুলো বাসায় করে আসবেন। প্রশ্ন হাতে পেলে তিনবার পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবেন সেগুলোতে দাগ দিন। যে প্রশ্ন লেখা শেষ হবে তাতে ক্রস চিহ্ন দিন। কখনোই কঠিন প্রশ্ন আগে দেবেন না। কারণ, এতে বেশি সময় ব্যয় হবে। ফলে, দেখা যাবে সহজ প্রশ্ন ঠিকমত লিখতে সময় পাচ্ছেন না। কোন প্রশ্নই ছেড়ে আসবেন না। অন্তত দু'এক লাইন হলেও লিখে আসুন। কারণ, এটাই হয়তো আপনার পাশ, ফেল বা A, A+ পাওয়ার পার্থক্য গড়ে দেবে।

৬. বেশি কথা লিখবেন না

প্রতি বিষয়ের প্রতি প্রশ্নেরই উত্তর দেবার নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। প্রত্যেক প্রশ্নেরই উত্তরে প্রশ্নে যা জানতে চাওয়া হচ্ছে সে কথাটি উল্লেখ করুন। এরপর উত্তর লিখুন। বেশি তথ্য না দিয়ে তথ্যগুলোকে গুছিয়ে উপস্থাপন করুন। প্রধান পয়েন্টগুলোকে হাইলাইট করুন। প্রয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলোকে বক্স আকারে লিখুন। ছবি আঁকলে ছবির চারদিকে বক্স এঁকে বিভিন্ন অংশকে চিহ্নিত করুন। নীচে অবশ্যই ছবির ক্যাপশন দেবেন। প্রশ্ন যাই হোক, এর একটি উপসংহার লিখুন। কারণ, এর জন্য একটি নম্বর নির্দিষ্ট থাকে।

৭. অবশ্যই রিভিশন দেবেন

পরীক্ষার সময়ানুযায়ী রিভিশন দিতে হবে। যদি কোন প্রশ্নের উত্তর লিখতে মাঝপথে থেমে যান, তা হলে পরবর্তী প্রশ্নে চলে যান। সেই প্রশ্নটিতে গোল দাগ দিয়ে রাখুন। আপনার লেখা শেষ হলে রিভিশনের সময় সেই প্রশ্নে চলে যান। তারপর যা জানেন লিখুন। অবজেক্টিভ প্রশ্নের ক্ষেত্রে চেক করুন কোন প্রশ্ন বাদ পড়ল কিনা।

পরিশিষ্ট

এত-এত জ্ঞানগর্ভ আলোচনা আর উপদেশ শুনে নিশ্চয়ই মাথা ভার হয়ে গেছে। তা হলে চলুন, এবার এ অধমের গল্প শুনুন।

আমি ছোটবেলায় ক্লাসে সব সময় ফার্স্ট হতাম। তারপর ধীরে ধীরে রেজাল্ট খারাপ হতে থাকে। ক্লাস সেভেনে আমার রোল হয় ২৪। তখন মূলত পবিত্র কোরআন আর কোয়ান্টাম মেথড পড়ে আমি নতুন উদ্যমে পড়া শুরু করি।

এ সময় আমার খুব শখ ছিল গান গাওয়ার। কিন্তু সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত ভাঙা কণ্ঠস্বরে গান গাওয়া আরম্ভ করায় আমার এলাকা কাকপক্ষীশূন্য হয়ে পড়ে। তখন একটা পত্রিকায় পড়েছিলাম, এক লোক বিখ্যাত একজন ভায়োলিনবাদককে বললেন, ২০ দিনে তার মত ভায়োলিন বাজানো শিখিয়ে দিতে। তিনি বলেছিলেন, 'এমন বাজানো শিখতে আমার সময় লেগেছে ২০ বছর। তাই আপনাকে ২০ দিনে শেখানো সম্ভব না।' তাই আমি ভাবলাম চেষ্টা করেই দেখা যাক। আমি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার চেষ্টা করি। এর মাঝে দু'বার গান গাওয়ার সময় সবার সামনেই গান থামিয়ে দিতে বলা হয়। এতবড় অপমানও গায়ে মাখিনি। কারণ, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকেও একবার বক্তৃতা দেবার মাঝখানে নেমে যেতে বলা হয়েছিল। তাই বলে আমি নিজেকে তাঁর সাথে তুলনা করছি বলে ভাববেন না। আমি শুধু লেগে থাকার কথা বলছিলাম। আমি দিনরাত পড়াশুনা ছাড়া শুধু গান গাইতাম। প্রায় ১৩ বছর পর এখন আমি মোটামুটি ভাল গান গাইতে পারি। আমার বন্ধুবান্ধবের মাঝে আমার ভক্তও আছে, যাদের আমি এখন নিয়মিত গান শোনাই।

আমার ইচ্ছে ছিল বিশাল একজন লেখক হবার। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো আমার গল্প, কবিতা এতটাই নিম্নমানের ছিল যে, স্কুলের ম্যাগাজিনেও তাদের জায়গা হত না। কিন্তু আমি হাল ছাড়িনি। আরেকটু বড় হয়ে আমি বিভিন্ন পত্রিকা, ম্যাগাজিনে লেখা পাঠাতে থাকি। কিন্তু কেউ কোন লেখা ছাপেন না। অবশেষে হঠাৎ একদিন যায় যায় দিনের সম্পাদক শফিক রেহমান আমাকে একটি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানালেন। এটা ছিল একটা

টার্নিং পয়েন্ট। তিনি বলেছিলেন, 'চিঠি লেখা অভ্যাস করো আর মানুষের প্রতিক্রিয়া দেখো। যত বেশি প্রতিক্রিয়া হবে বুঝতে পারবে যে তোমার লেখা ধারাল হচ্ছে।' তাঁর উপদেশমত আমি আমার বন্ধুবান্ধব নির্বিশেষে সবাইকে চিঠি লেখা আরম্ভ করলাম। খুব দ্রুতই আমার নামে নানান রটনা ছড়িয়ে পড়ল। আমার মাথা খারাপ। শুধু হাবিজাবি চিঠি লিখি। কিন্তু আমি চিঠি লেখা বন্ধ করিনি। ৫ বছর পর আমার বিশ্বাস হলো যে, এখন আমার লেখা একটু পড়বার মত হয়েছে। এবার লেখা পাঠানো শুরু করলাম এবং আশ্চর্য ব্যাপার! যাই পাঠাচ্ছি কবিতা, গল্প, যেখানেই পাঠাচ্ছি সবাই ছেপে দিচ্ছেন। নিজের লেখা দেশের প্রধানতম পত্রিকায় দেখতে খুবই ভাল লাগে। এভাবেই, এখন আপনারা আমার লেখা বই পড়ছেন।

তাই আপনাদের বলছি, বিশ্বাস করুন, আপনি যা চান তাই করতে পারবেন। আর তার জন্য দরকার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, পরিকল্পনা এবং তার বাস্তবায়ন। আপনি যে ক্ষেত্রে সফল হতে চান সেই ক্ষেত্রের কোন সফল ব্যক্তিকে অনুসরণ করুন। তিনি কীভাবে কাজ করেন তা শিখুন। একদিন আপনি তাঁকেও ছাড়িয়ে যেতে পারবেন।

আমাদের আগের জেনারেশন আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপহার 'স্বাধীনতা' দিয়ে গেছেন। তাঁরা স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁদের সন্তানেরা একটা সুন্দর দেশে সুখে শান্তিতে বসবাস করবে। কিন্তু আমরা এখনও অন্ধকার যুগে পড়ে আছি। আমাদের দায়িত্ব আমাদের পরবর্তী জেনারেশনের কাছে একটি দুর্নীতিমুক্ত সুন্দর দেশ রেখে যাওয়া।

ইসলাম খুব নির্দিষ্টভাবে সব কিছুর মর্যাদা বিধান করেছে। প্রথম প্রাধান্য আল্লাহর, দ্বিতীয় মায়ের আর তৃতীয় মাতৃভূমির। আপনি ঠিকমত পড়ালেখা করলে এ তিনটি মর্যাদার প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়। আমাদের দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে আমাদেরই। আর

এজন্য দরকার শিক্ষা। আপনি যে পেশাতেই যান নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করুন, তারপর দেশের জন্য কাজ করুন। আপনার সাফল্য আপনার ও দেশের উভয়ের জন্যই সম্মান বয়ে নিয়ে আসবে। বেঁচে থাকাটা তখন মনে হবে অনেক বেশি অর্থবহ। তা হলে বিদায়, বন্ধু। আপনার অগ্রযাত্রায় আমি প্রার্থনা করছি, যেন সাফল্যের গন্তব্যে পৌঁছতে পারেন নির্বিঘ্নে ও নির্দ্বিধায়। খোদা হাফেজ।

Bibliography

Adam Khoo—'I am gifted, so are you.'

Adam Khoo with Stuart Tan— 'Master your mind & design your destiny.'

Bandler—'Structure of Magic II,' 'Time for a change,' 'Using your brain for a change.'

Tony Buzan—'How to make the most of your mind.' 'The Mind Map.'

Covey—'The seven habits of highly effective people.'

Dilts—'Application of neurolinguistic programming. '(NLP)' Changing beliefs with NLP.

Jensen—'Brain based Learning & Teaching.' 'Super learning.'

Mukerjea—'Super Brains'

O'Conner—'Training with NLP'

Ostrander—'Super learning 2000, Super Memory, the Revolution.' 'Cosmic Memory.'

Robbins—'Unlimited Power, Awaken the giant within.'

Rose C.—'Accelerated Learning.'

Shone S.—'Creative Visualization.'

আত্ম-উন্নয়ন

আধুনিক নিয়মে লেখাপড়া

ডা. রেজা আহমদ

বদলে যাচ্ছে পৃথিবী। এ পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পারলে পিছিয়ে পড়তে হবে অচিরেই। একবিংশ শতাব্দীতে সামরিক শক্তি কিংবা খনিজ সম্পদের চেয়েও মানুষের মেধাকে অনেক বেশি মূল্যবান বিবেচনা করা হচ্ছে। মানুষ জন্মসূত্রেই মেধাবী। কিন্তু তা কাজে লাগানোর কৌশলের অভাবে অকাল মৃত্যু হচ্ছে অনেক সম্ভাবনার। এ বইটি বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর পড়ার পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে একজন ছাত্রের মেধার যথাযথ বিকাশের সহায়ক হিসেবে লেখা হয়েছে। এ ছাড়া, বইটিতে সময় নিয়ন্ত্রণ আর গুরুত্বানুযায়ী পড়া চিহ্নিত করা এবং তা মনে রাখার নানা কৌশল সন্নিবিষ্ট হয়েছে। ফলে বইটি পড়ে ছাত্রদের পাশাপাশি শিক্ষক ও অভিভাবকরাও উপকৃত হবেন। তাঁরা দিতে পারবেন নিজেদের উত্তরসূরিদের যথাযথ দিকনির্দেশনা। তাই ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতিগতভাবে ভবিষ্যতের 'মেধাবী বাংলাদেশ' -এর অংশ হতে চাইলে অবশ্যই পড়ে দেখুন ডা. রেজা আহমদের 'আধুনিক নিয়মে লেখাপড়া'।

-বিদ্যুৎ মিত্র

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো- রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো- রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০